KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : 28/2 অখ. এ. মমস রোড, কল-৬৩
Collection : KLMLGK	Publisher : তুলসী মুখোপাধ্যায়
Title : অনুভব (ANUBHAB)	Size : 8.5"/5.5"
Vol & Number : 1 2/1-2 ?? 3/1-2 3/3-4 Puja Special	Year of Publication : Oct 1977 বৈশাখ ১৩৮৫ Oct 1978 May 1979 Sep 1979
Editor : তুলসী মুখোপাধ্যায়	Condition : Brittle Good ✓
	Remarks

C.D. Rod No : KLMLGK

দ্বিতীয় বর্ষ ।। প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা
বৈশাখ ১৩৮৫

তুলসী মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

অনুষ্টুপ

কবিতা পত্র

অনুভব কবিতা পত্র
কবিতা ও কবিতা-ভাবনার ত্রিমাসিক
যুগ্ম সংকলন
বৈশাখ ১৩৮৫

কবিতা — কৃষ্ণ ধর সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় মণীন্দ্র ঘটক সজল বন্দ্যোপাধ্যায় নারায়ণ মুখোপাধ্যায় বার্ণিক রায় শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় রত্নেশ্বর হাজরা অপূর্ব মুখোপাধ্যায় শ্যামল পুরকায়স্থ মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মলয় ঘোষ কবিতা সিংহ ব্রততী বিশ্বাস পরমেশ্বরী রায়চৌধুরী আলোক সরকার ফণিভূষণ আচার্য জগন্নাথ ঘোষ কণাদ গঙ্গোপাধ্যায় সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় গৌরাঙ্গ ভৌমিক আশিস সান্যাল গৌতম গুহ মতি মুখোপাধ্যায় জয়া রায় দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায় রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় শুভ মিত্র স্বপন রায় শান্ত রায় সুকল্প চট্টোপাধ্যায় অশোক কুমার গুহ কাজল চক্রবর্তী রাজা মজুমদার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অমিতাভ দাশগুপ্ত চিত্ত সিংহ অরবিন্দ ভট্টাচার্য শুভ বসু অমূল্যকুমার চক্রবর্তী তুলসী মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক ও প্রকাশক ॥ তুলসী মুখোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ নামাঙ্কন ॥ অরুণ মুখোপাধ্যায়
মুদ্রণ ॥ অধুনা

কার্যালয় ॥ ২৪/২, আর. এন. দাশ রোড, কলকাতা-৩১

আনন্দ বাগচী

জন্ম : ১৯৩৩

বৃত্তি : অধ্যাপনা এবং সাংবাদিকতা

কবিতার বই

স্বগত সন্ধ্যা ১৯৫৩
তেপান্তর ১৯৫৯
স্বকাল পুরুষ ১৯৬৪
উজ্জ্বল ছুরির নিচে ১৯৭৭

আনন্দ বাগচীর নির্বাচিত কবিতা

কোন কলেজের মেয়েকে

□

কাঁঠালী ছায়ায় পায়ে পায়ে টানা পথ
এখনো দুপুর-তৃষ্ণা মেটায় নাকি ?
দেওদার ডালে ঝোলে কি রৌদ্র শপথ
মনে মনে আজো উৎসুক হয়ে থাকি।

আজো দুপুরের ঘণ্টা যখন শুনি
মনে পড়ে যায় কৃষ্ণচূড়ার তলে
প্রহরে প্রহরে শুনেছি পদধ্বনি,
ঘুরে ঘুরে গেছ কতবার কত ছলে।

কি ব্যথা তোমার যদি জানতেম, কোনো
জানালার ধারে ক্লাসে বসে চঞ্চলা
শীতের অলস সকালে কি গান বোনো
কত কথা ছিল জানো তা হয়নি বলা।

ঘড়ির ডায়ালে চেনা ছায়া আজও পড়ে
ঘড়ির কাঁটায় কপোতের কাঁপে স্বর
কানিশে এসে শেষ রোদ যাবে ঝড়ে
মনে মোর জাগে সেদিনের মর্মর।

মানি নাই প্রেম জানি নাই ভালোবাসা
ব্যস্ত ছিলাম অনেক অনেক কাজে
এখন গোপন যন্ত্রণা পাতে বাসা
হৃদয়ে করুণ একটিই সুর বাজে।

রাত্রি তোমার আমার জন্যে নয়
পারো তো দীর্ঘ দগ্ধ দুপুর দিও
আমার দুচোখে তোমার বন্য ভয়
বাতায়নে অবগুণ্ঠন টেনে নিও।

কাব্য এখন সযত্নে থাকে তোলা
রাত্রে লেখনী এখন নিষিদ্ধই
সব শেষে দেখি হয়নি তোমাকে ভোলা
সময়ের জ্বরে এই মন বিদ্ধই।

মৃত্যুর পর

□

নেই সে পাতা-কুড়োনী রোদে হাওয়ার করতালি,
নেই সে আলোছায়ার চাবি যতই কেন হৃদয় ভাবি
উড়েছে সেই শালিখ-ভোর সময় গাঢ় বালি।

পদ্মকলি সকাল গেছে কবরমুখো সন্ধ্যা
গিয়েছে শালপাতার দিন ফাগুন রোদ, ঘাসের চিন্,
পুড়েছে চোখ উড়েছে চুল, ধোঁয়ায় তনু লীন—
হয়েছে আজ, তোমার ছায়া ছিঁড়েছে রোদে, বন্ধ্যা।

এখন রাত উদাস হাত নড়ে না ভীরু পাতা,
ব্যাকুল বোবা গাছের ডালে পাখির সাড়া-শব্দ
দারুণ তিন পহর রাতে এখন নিস্তব্ধ।
কুয়াশাপুরু লেপের নিচে ঘুমায় কলকাতা।

এবার যদি আমার এই শীতের সমাধিতে
জড়াও ঘাস ছড়াও পাতা, মাখাও কচি রোদ
নিঝুম ঘুম শিশিরে ধোও আমায় মুছে দিতে
আমার এই জানালা করো বাতাসে অবরোধ !

মরেছে নদী এমন রাতে মজেছে ধানশীষ,
হরিণকাঁদা হিমের রাতে আকাশ চাঁদে দগ্ধ ;
তখন তুমি এসেছ ইশ্, দুয়ার তলে নির্নিমিষ
জ্বালায়ে ধরে নয়ন দ্বীপ বসন অনুলব্ধ ॥

আত্মবিলাপ

□

দেয়ালে ঠেস দিয়ে ধুঁকছে কামদক্ষ উলঙ্গ নগর।

নিক্ষিপ্ত উল্লাসে জ্বলছে কলহান্তরিতা নিধুবন
আঁকাবাঁকা জল চতুর্দিকে সেই বেতস কুঞ্জের,
কায়মনোবাক্যে ভাব্‌ছি কলকাতার মহিলামহল,
চায়ের দোকানে আমরা ক্ষিপ্রকান্তি অযোনি-সম্ভূত।
ধাতব চিৎকার, মৃত্যু, কুটিল করুণা চতুর্দিকে
খেলা করে (একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু)
বাইরে বেলা পড়ে এলো জল সই, স্বপ্নের জটায়ু—
কি জানি কোথায় আছ সাত সমুদ্র কিংবা তের নদী।

সব অন্ধকার জুড়ে রিপু ভয়, হে লুণ্ঠিতা, স্খলিতা নায়িকা,
তোমাকে না চিনি যদি, যদি চপলতা ঘটে আজ,
তুমি কি নেবে না চিনে হে রাত্রি, হে মেঘবর্ণ কেশ
প্রলয় পয়োধি জলে দেহ দশদিকে ভেসে যায়
তবু আমি মনে মনে একনিষ্ঠ স্বকালপুরুষ,
কৃত্রিম যৌবন জুড়ে ব্যভিচার, রিপুভয় সমস্ত উৎসবে।

বাংলা ছন্দ

□

যেন একই নারীর সঙ্গে লিপ্ত আছি দিনরজনী
যেন একই গল্পে গাঁথা, ধর্মতলায়
ট্রামের ঘূর্ণী, বাসের মোচড়, জাহাজ ঘাটের
বাঁশির শব্দে এখনও হয় বুকের মধ্যে জোয়ারভাঁটা
কিছুই যেন খোয়া যায়নি ভিড়ের মধ্যে
যা ছিল সব তেমনি আছে শহর এবং শহরতলী
দিনের দৌড় রাতের দৌড় লোকাল ট্রেনের।

ফটোফ্রেমের মধ্যে ধরা রূপসীমুখ,
জন্ম জন্ম একই আছে জনমানুষ মিছিল-ফিছিল
সদর-মফস্বল ডুবেছে হঠাৎ বর্ষা ঋতুর বন্ধে
পরিবহন আটক, স্কুলের ফাটক বন্ধ, অফিস কামাই
সাবেক কালের বাংলা ছন্দে জীবন যাপন
বোমার শব্দ গুলির আওয়াজ সোডার বোতল॥

বাসা বদল

□

বাবলার কাঁটাডালে নখর চিহ্নিত লাল চাঁদ
হাওয়ার শীৎকারে কাঁপে ভ্রষ্ট, ধৃত, নষ্ট গোপনতা
সমস্ত আকাশ জুড়ে শেষ প্রহরের অন্ধকার
নাগর দোলায় দুলছে রাশি চক্র, কুয়াশার মত ছায়াপথ
বিচ্ছুরিত আয়নায় দিগন্ত বদলায় সারাবেলা
এরই মধ্যে বাসা-বদল এরই মধ্যে বিবাহ সংসার
প্রণয় ভাবনা আর প্রজনন,
বাসস্টপে দাঁড়িয়ে
শেষবার রুমাল নাড়া, হেঁট মুণ্ডে বুকে হেঁটে বহু কায়ক্লেশে
নিছক ভদ্রতাবশে কথা রাখতে জন্মান্তরে আসা।

বেতের ফলের মত মৃত হিম চোখের তারকা
কাঁটায় কাঁটায় থেমে আছে বন্ধ ঘড়ি
এইরূপ পৃথিবীর বিশুদ্ধ তামাসা
কারেন্সি নোটের মত প্রেমপত্র, কানামাছি সুখ।
কুঠারে লুটায় গাছ, বৃক্ষছায়া হেলে পড়ে কামুক দর্পণে
আদুল পুকুরে যেন মধ্যাহ্নের তপ্ত শ্রোণীভার
এরই মধ্যে বাসা বদল, এরই মধ্যে বিবাহ, সংসার।

চিরন্তনী

□

কি নেই বল, কি নেই আজ সবি তো ঠিক আছে
যা ছিল দূরে এখনো দূর যা ছিল কাছে, কাছে।
এখনো দেখ ফাগুন দিনে বাতাসে মৃগনাভি
সকল তৃণ শূন্য করে যৌবনের দাবী।
আকাশ জুড়ে অন্ধকার মেঘের গুরু গুরু
এখনো বুকে চমক দেয় প্রিয়তমার ভুরু।
বাদল আনে কদমফুল বাদল আনে কেয়া
এখনো হয় নিকটে দূরে হৃদয় দেওয়া-নেওয়া
শহর ডোবে শহরতলী অথৈ ঘোলা জলে
দুটি-একটি রিক্‌শা চলে, চতুর করতলে
কে যেন চাপে রঙের তাস কে যেন করে খেলা
মনের মধ্যে কখন গেল কেমন করে বেলা!

এখনো সেই কানে-কানের গল্প বলার ছলে
অন্ধকারের জ্যান্ত মুঠোয় যুবতী চাঁদ জ্বলে॥

অমিল পয়ার

□

এমনি করে মিল ভাঙে, পড়ে থাকে পদ্যের খোলস—
অক্ষরের নষ্টনীড়, চরণের আচরণে পয়ার মেলে না,
লক্ষ্যভ্রষ্ট শব্দ ফাটে, দেওয়ালীর রাতে ক্লিষ্ট বাজীর আকাশ
খুলে দেয় কটিবন্ধ নাভি নিম্নে, ছন্দের কাঁচুলি ছিঁড়ে পড়ে
বর্ণছুট জোড়গুলি চিড় খায়, মিল ভাঙে হ্যাজ গৃহস্থালি
ভুল হয় সপ্তপদী, পরিবহনের মন্ত্রে কদম মেলে না।

'বধূ শুয়েছিল পাশে, শিশুটিও ছিল,' আজ এখন কেউ নেই
বরাদ্দ বিছানা থেকে, ব্যবহৃত সংলগ্নতা থেকে, স্বপ্ন থেকে
সরে গেছে, চিরকাল যেমনি যায় আঙুল মুঠোর মধ্য থেকে
প্রণয়-কুপিতা নারী, বিজড়িত বধূ আর আত্মজ ছলনা,
সমস্ত অচেনা লাগে, নিকট-দূরের মুখ, প্রতিশ্রুতি
একক সংলাপ,
সংসার খোয়ারি ভাঙে, অসহিষ্ণু পাশ বদলে নেয়;
এমনি করে মিল ভাঙে, পড়ে থাকে বিষধর পদ্যের খোলস,
গল্প শুধু একই থাকে পাশের বাড়ির ছাদে নতুন 'ম্যারাপ':
এঁটো ভাঁড় কলাপাতা ঘেয়ো কুকুরের ডাক সানাইয়ের শব্দে মিশে যায়

অপরাহ্নের খেলা

□

এখন বুকের কাছে হৃদয় হৃৎপিণ্ড কিছু নেই
এখন বুকের কাছে শুধু ঝোলে বিশাল পকেট,
পকেটে দরকারী চিঠি, ফর্দ, টাকা, ট্রেনের মাসিক
এখন মাথায় শুধু ছুটচিন্তা হাজরে খাতা, অফিস ফাইল
মুখস্থ কামরায় উঠে টুকরো সিংহাসন ফিরে পেলে
উড়ুক্কু তাসের মধ্যে একহাত, চিৎকৃত সংলাপ—
সৌজন্যের সিগারেট, মেঠো গল্প খুচরো রাজনীতি
কবন্ধ ভিড়ের মধ্যে কিছুক্ষণ মুণ্ডহীন অন্তরীণ থাকা
চোখের সামনে দিয়ে দ্রুতলয়ে ছুটে যায় নিষ্ফল সংসার
যেন খণ্ড গৃহস্থালি, চূর্ণ ছবি, বাগান পুকুর
চঞ্চল নারীর রূপ, শব্দহীন তারবার্তা
ব্রেকজার্নি করা স্থির পাখি,
নিসর্গ এবং নষ্ট নীড় যায় নিস্পৃহ চোখের সামনে দিয়ে।

এখন বুকের কাছে হৃদয় হৃৎপিণ্ড কিছু নেই
এখন বুকের কাছে ঝুলে থাকে বিশাল পকেট
চলা শুধু চলা যেন দ্রুত অপরাহ্নে চলে যাওয়া—
এখন মাথার মধ্যে ছুটচিন্তা : প্ল্যাটফর্মে ন-টা বিয়াল্লিশ!

কবিতার উৎস

আনন্দ বাগচী

কবিতা লেখার প্রক্রিয়া লিখে জানানো শক্ত।

কবিতা রচনা যদিও অনেকটা রান্নার পর্যায়েই পড়ে তবু তার কাঁচা মালমশলার ফর্মুলার অতিরিক্ত সেই জিনিসটা কবি নিজেও সজ্ঞানে ভালো-ভাবে জানেন না। রান্নার মতই কবিতাতেও একটা আলাদা স্বাদ থাকে, যেটাকে হাতের স্বাদ বলি—সেটা জনে জনে, কবিতে কবিতে বদলায়। সেই স্বাদটা আসলে কিসের? হাতের না মনের? কবি তাঁর মনকে যেভাবে এই উপাদান উপকরণের পাঁচ ফোঁড়ন মশলার সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে পাকিয়ে তোলেন সেই পরিপাকটুকু জ্ঞানগোচর বুদ্ধিগোচর নয়। তাই প্রক্রিয়ার বাইরের ক্রিয়াটুকুই শুধু বলা যেতে পারে, তার অন্তর্লীন রহস্যটুকু ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়।

তা কি ভাবে কবিতা লিখি সেকথা বলার আগে কেন কবিতা লিখি সেকথাটা বলতে হয়। অন্য লেখা লিখতে পারিনে বলে কিংবা কবিতা লিখতে পারি বলেই কবিতা লিখি এটা সত্যভাষণ হল না। এই দুটির কোনো একটি কারণেই কোনো কবি সম্ভবত কবিতা লেখেন না। অপর কোনো লেখারই বিকল্প হতে পারে না কবিতা। তাই গদ্য লিখতে শিখেও কবিতা না লিখে উপায় নেই কবির।

এই জীবনের, এই জগতের অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধিকে এমন নির্ভুল নির্যাসে ধরে দিতে আর কোনো শিল্পই বোধকরি সক্ষম হয় না। নিজের সবচেয়ে চমকপ্রদ সূক্ষ্ম ও ক্ষিপ্র প্রকাশ এই কবিতার মধ্যে—যা কথা দিয়ে বলা যায় না, রঙ দিয়ে আঁকা যায় না, আয়তনে ধরা যায় না। মন্ত্রপূত চাবির মত কবিতার শব্দময় পঙ্‌ক্তিগুলি এক অলৌকিক মোচড়ে দুটি হৃদয়ের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানকে চোখের পলকে খুলে দেয়। একটি যোগ্যতম যোগসূত্র যোজনা করে। কবিতা তখন আর বাণী নয়, গান; সেই গান যার ভেতর দিয়ে কেবল ভুবনকে নয়, ভুবনব্যাপী মনকে চিনি এবং জানি। কবিতা তখন তাই সঙ্গীত যার মধ্যে কবি-পাঠকের চারচোখের মিলন সম্ভব, তাদের যুগল অন্তরে একই রসের নিঃসরণ।

এত কথাতেও যখন স্পষ্ট হল না তখন থাকগে ওসব কথা। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথাতেই আবার ফিরে আসা যাক। আমার কোনো কোনো দেখা এবং শোনা মনের ভেতরে কখনো কখনো এমন এক প্রতিক্রিয়ার, এমন এক স্পর্শকাতরতার সৃষ্টি করে যার ফলে আমার মনে শব্দচিত্র বেজে উঠতে থাকে। সেই সঙ্গীত শিহরণকে আমি ক্রমাগত কথা দিয়ে ছুঁতে চাই, ধরতে চাই, ধরে দিতে চাই। প্রায় নাগালের বাইরের এই ব্যাকুলতাকে বোধ্য করে তুলতে গিয়ে আমি অনেক কসরৎ অনেক কাণ্ড করে থাকি। হীরের মত শব্দ কাটাই-বাছাই করি, উপমা হাতড়ে বেড়াই, মিল খুঁজি। একটা সময় ছিল আঙুলের কর গুণে কবিতার লাইনে অক্ষর বসাতাম, সেই অক্ষরবৃত্তিই ছিল কবিতা লেখার প্রথম পর্বের জপমালা। মনের ভাবকে কথায় এবং পঙ্‌ক্তির ট্রাফিক সিগন্যালের মধ্যে ধরিয়ে দেওয়াই ছিল তখন প্রধান সমস্যা, এবং সমস্যা ছিল স্থানসঙ্কুলানের চেয়েও মিলেরই বেশী। ক্রশওয়ার্ড পাজ্‌লের মতই যথাজায়গায় ওপরে নিচে কিছুতেই মিলতে চায় না, খাপে-খাপে বসতে চায় না। শব্দ যে কত শক্ত, কত কঠিন, তা তার মুখ বাঁকিয়ে থাকা দেখেই বুঝতে পারতাম। অনেক অচেনা শব্দ কাছে আসতো, অনেক চেনা শব্দও গা-ঢাকা দিত—কাউকে কাউকে কবিতার ফাঁদপাতা লাইনে যদি বা পাকড়াতে পারতাম, accommodation-এর পরেও যাকে বলে adjustment পুরোপুরি হতো না। আভিধানিক সাধাসাধির পরেও মনে হত ব্যাকরণের কিছুটা ছাড় পেলে শব্দের আকার সামান্য পাল্টে নিতে পারলে মিলটা লাগসই হতো। তারপরে একদিন কর গোণার পর্ব শেষ হয়েছে, ছন্দ কানের শরণ নিয়েছে, শব্দ এবং মিল অনেকখানি কলমসহ হয়ে গেছে আমার। সে সময় হৈ-হট্টগোলের মধ্যেও, সবরকম প্রতিকূলতার মধ্যেও, কবিতা লিখতে পারতাম। বরং বলা ভাল, বিরুদ্ধ পরিবেশই ছিল আমার কবিতা লেখার উদ্দীপক। বাইরে থেকে যত আমি কোণঠাসা হতাম ততই আমার মন স্ফূর্তি পেত। কবিতার লাইন তখন বুকের মধ্যে আমূলবেঁধা ছুরির মত সর্বক্ষণ বয়ে বেড়াতাম। সেটা ছিল বোধহয় ঝর্ণার যুগ, নুড়িপাথরে না ঘা খেলে জলতরঙ্গ তীব্র নিখাদে বাজতো না। মনে আছে, ট্রামেবাসে ট্রেনের জানলায়, চায়ের দোকানের বারোয়ারি টেবিলে কি ক্লাস নোটের ফাঁকে ফাঁকে কবিতা লিখেছি। আজ পারি না। ডামাডোলের মধ্যে তো নয়ই, অথও অবসর অবকাশের মধ্যেও সব সময় পারি না। ব্ল্যাড ক্যান্সারের

মত কবিতা এখন আর রক্তের মধ্যে ঘুরপাক খায় না, দূরে সরে গেছে। একটা চিলের ডাক, কার্নিশের এক পোঁচর রোদ্দুর কিংবা ভাঙা বোতলের কাঁচের মত কিশোরীর প্রোফাইলের চকিত রেখা আর বুকের মধ্যে কবিতার লাইন হয়ে বিঁধে পড়ে না। কবিতা এখন ভাবতে হয়। এরই নাম বয়স। কবিতা বুঝি যৌবনের ফুল, প্রৌঢ়ত্বের ফল নয়। সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি এবং কিছুকাল কবি। আমি সেই কেউ-কেউ-এর দলে কিনা জানি না, তবে সেই কিছুকাল যে পেরিয়ে এসেছি অনেকদিন তাতে সন্দেহ নেই। এখন কবিতা লেখার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই, দিনও নেই—দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ফাঁকা চলে যায়, কবিতার কোনো ভাবনাই হয়তো চেপে থাকে না, দখল করে থাকে না মন-মেজাজ। কবিতা আগে ছিল প্রত্যক্ষ, এখন সেইভাবে ছবির লাইন সুদ্ধু বুকের ভেতরে ঘা দেয় না, একটা লাইন চুম্বকের মত অন্যলাইনগুলোকে টেনে আনে না। এখন কবিতা আগে একটা ভাবে দানা বাঁধে, মৌল বক্তব্যে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়, তারপরে কবিতা লিখতে বসি। আগে ছিল প্রেম, প্রেমের বিস্ময় এবং আনন্দ, প্রেমের কেন্দ্রে ছিল একটি না-দেখা নারী, যার অস্তিত্ব আমার কাছে ছিল অত্যন্ত প্রখর—আজ নিঃসঙ্গতা এবং বিষাদ আমার কবিতার অবলম্বন। এবং মৃত্যু—মৃত্যুর ভাবনাই বারবার নানা রূপে এবং রূপকে ফিরে ফিরে আসে।

কৃষ্ণ ধরের কবিতা

বই মেলা ১৯৭৮

□

বিকেলে বইমেলায় ধুলো ঘাসে একা একা মস্ত ভিড় হাঁটে
কাউন্টারের সামনে অজগর লাইন এঁকেবেঁকে
প্ল্যানেটারিয়ামের ফুচকাওয়ালাকে ছুঁয়ে গেছে সাড়ে তিনটেয়।
ওইখানে মৃচকুন্দ গাছ ছিল আশ্বিনেও দেখে গেছি একা
আরও অনেক গাছ দেখেছিল ঘাতক ঝুড়ুল
এখন এম.টি.সির কোপে তারা সব পাতালে সেধেছে।

রাঙা রাঙা প্যাভেলিয়ানের ভেতরে বইয়ের মতন নারী
আর নারীর মতন বই সেজেগুজে ভিড় করে আছে।
এই সব বই যারা তুলে নিয়ে উল্টেপাল্টে দ্যাখে
মলাটের গন্ধ শোঁকে
তাদের সবার হাতে মানুষের হৃদয় আর মননশীলতা
স্বপ্ন গল্প মীমাংসার কথকতা,
ঘুরে ফিরে ক্লান্ত হয়ে
বিকেলের ম্লান রোদে
চোখ বুজে শুয়ে থাকে ধুলো আর ঘাসে।
পাঠকের লংমার্চ শেষ হলে
কালো কালো অক্ষরেরা চলে যাবে মানুষের মগজের শেষে
একদিন আচমকা বিদ্রোহ ঘটাতে।

তাই বুঝি সভ্যতার ভয়

□

জনসভায় হৈ হল্লার কারণে
পরদিন ব্যানার হেড লাইনে জুটল তিরস্কার
অথচ আদতে তাদের কোনো দোষ ছিল না।
একটু ভেবেচিন্তে দেখলেই বোঝা যায়
মানুষের ব্যবহার সর্বত্রই একরকম

কলকাতা কি সিকাগো কি বুয়েনেস এয়ারেস
তাদের স্বপ্নেরও বিস্তর মিল
জিজ্ঞাসারও একই ধরণ ধারণ।

আসলে সকলেই ঘর-গেরস্ত, পাড়াপ্রতিবেশী
সবারই বালবাচ্চার চিন্তা, তদারকি
একটু আধটু প্রেম ভালবাসা
কেউ কেউ এরি মধ্যে ডাকাবুকো, বুনো ঘোড়ার মতো তেজী
গেরিলা-স্বভাব
তবে সর্বত্রই এক প্রশ্ন : নিরাপত্তা, শান্তি, স্বস্তি,
ভালবাসা
অবশ্য একসঙ্গে এতগুলো মানুষের ওঠাবসা, উচ্চারণে
অনেকেই আঁৎকে ওঠেন
অডাক, কুডাক দেয় মন।

আসলে ওরা কেউ সমাজ বিরোধী নয়
সকলেই অমল বিমল রফিকুল, দমন ওরাঁও
ওরা খোঁজে স্বপ্ন, শান্তি, নিরাপত্তা আর কিছু নয়
তাই বুঝি সভ্যতার ভয়।

বাস স্টপে

□

বাস স্টপে রোজ কিছু চায় নোংরা হাতে
করুণা কি দয়া কারো হয়
কেউ বা ফেরায় মুখ
বাসে উঠে চলে যায়
ওরা জানে গতিতেই সুখ
কৃষ্ণচূড়া ফুটে থাকে মোড়ে
এপ্রিলে যুবতী যেন শাদা রোদে খোলে প্যারাসোল,
ভিখিরির শীর্ণ নোংরা হাতে
অবিরল ফুলের পাপড়ি খসে পড়ে।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের কবিতা

বর্ণনা করোনা

□

হলুদ আত্মাটি থাক, তাকে তুমি বর্ণনা করোনা ;
বরং খানিক নিচু হও, এক ভরামুঠি ঘাস ছিঁড়ে
সেই সামান্য সবুজ করো নিজের ভাষায় আলোচনা।
মাটির ওপরে ঘাস, ঘাসের ওপর মানুষের প্রতিহারী জুতো
কবেকার বাসী প্রতিজ্ঞার মতো অনড় এবং নীল নির্বোধ আকাশ
ওই এলাকা-ঈশ্বরে চোখ তোলার আগেই
দুচোখের মাথা খেয়ে লক্ষ্য করো ছিন্ন দুর্বাদল, অর্থাৎ
যে-কোনো হলুদ আর তার আগের সবুজ
সাদায় কালোয় লিখে ফ্যালো,
আমি পড়ি, তুমি পড়ো, তিনিও পড়ুন……

রঙের গানের পাশে এভাবেই জেগেছে প্রমাণ
চোখের নিজস্ব জলে সমুদ্রও কি বিস্ময়ে চেয়েছে লবণ !
শব্দ দায়ী নয়, শব্দতো কপাল ছেঁড়া করাঘাত করে
কার আঘাত তার চেয়েও অনেক বেশী রুধির সঞ্চারী ?
রক্তের সুবিধা এই ধমনী না ফাটিয়ে বাইরে এলে
বোঝাই যায়না দুঃখ কতো সফল বিষাদ !

হলুদ আত্মাটি থাক, তাকে তুমি বর্ণনা করোনা
তোমার আত্মীয় কেউ নেই ওই তন্মাত্র হলুদ ছাড়া,
এখন আর কি বিশ্বাস করানো যাবে
তুমিই একদা ছিলে ঘাসের নির্দয় সত্য, কৃপাণ সবুজ !

সাতটি চেয়ার ঃ পুরুষ রমণী তারা সাতজন

□

সাতটি চেয়ারে তারা বসে আছে
বাইরে ভারতবর্ষ, বাইরে বাংলাদেশের কলকাতা
এদেশ নতুন দেশ, এই দেশে একমাত্র সাতজন স্বদেশী !

স্বদেশীরা বসে আছে আর তারা কথা বলছে
অদ্ভুত এক সান্ধ্য-ভাষায় ভরে উঠছে সন্ধ্যা !
পানীয় খাদ্য আসছে শেষ হচ্ছে তারা কথা বলছে
বানিয়ে ফেনিয়ে তারা বলছে কথা···

হয়তো বা চুপ করে থাকায় ভীষণ ভয়
চোখে চোখ তাকাতেও ভয়—চোখ বড় বিষণ্ণ এলাকা !
শাড়ী, ব্রেসিয়ার, বুশসার্ট, গেঞ্জী, পাৎলুনের নিচেই অথচ
পুষ্ট দামী কালো লাল যৌনাঙ্গের কি অসহ নীরবতা
তার চেয়ে কথকতা হোক
একটিও নতুন অর্থ যোগ না করলেও চলুক
শব্দের ছোট ব্যবহার !
—এই বয় ! আরেকটা উঁচু পেগ
আনো দু-প্লেট ঝাল মুর্গী, একটা পুডিং ;

সাতটি চেয়ারে যেন সাতদিনের সমস্ত নির্বোধ
তৃষ্ণা ও ক্ষুধা ও আত্মপ্রতারণা আজ শব্দ বিভীষিকায় উঠেছে মেতে !

জলাপাহাড়

□

তোমার জন্যই আমার উদ্‌ভ্রান্ত শব্দ
প্রাচীন পাথরে খোঁজা নতুন তুষার,
তোমাকেই আমার প্রথম ও অন্তিম নিবেদন ;
জাগো, আমার দুহাতে তুমি জাগো
যোনির খনিতে নয়, নয় স্খলনউন্মাদ উরুস্তম্ভে,
ঐ জলাপাহাড়ের কুয়াশাশেখানো
গোলাপীয় ভোর ভেঙ্গে ভীল সূর্যের মতো
দার্জিলিং ছিঁড়ে তুমি, দুঃসাহসে
আরো একবার হে কবিতাকুমারী লাফ দাও
পাখি হয়ে ওঠো ওই কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে ;
সমতলের জল ও জলায় ফেরার আগেই
আমি তোমাকে তোমার দুই পাহাড় ও জঙ্ঘা সহ ধরে ফেলবো !

শব্দব্রহ্ম সাধা হবে এরই কিছু পরে।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কবিতা

তবুও

□

ঘর ভেঙে যায়, তবু শূন্যের ভেতরে
আমরা কান পেতে থাকি।
যদি কোনো শব্দ হয়, যদি কেউ
আশ্বাসের কথা ব'লে যায় !

আমাদের অপেক্ষার কোনো শেষ নেই—
একদিন একটা কিছু ঘ'টে যাবে ব'লে
আমরা শুকনো পাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে ঘরে যাই।
সেই ঘরও যদি ভেঙে যায়
শূন্যের ভেতরে আমরা ভিক্ষুকের মতো হাত পাতি—

একটা হলুদ পাতা ঘুরতে ঘুরতে দূরে যায়।
আমরা তবুও কিন্তু বিদায় মানি না।
আমাদের পরাজয় নেই ?

ফাঁকফোকর

□

ফাঁকফোকরের মধ্যে, ফুঁসে ওঠে সমস্ত জীবন :
একটা পোকা ক্রমাগত ঘুরে মরছে—
তাকে এইবার ব'সবার জায়গা দিলে
ভালো হয়। আমি তার দিকে
একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে
পুরোটা বুঝবার খুব চেষ্টা ক'রবো।
সেও হয়তো একইভাবে তাকাবে আমার দিকে।
দেখা যাক।

ফাঁকফোকরের মধ্যে, দু'একটা মুখ উঁকি দেয়।
সাপ গিরগিটির মুখ, ছাতাপরা ব্যাঙের আদল,

কখনো বা আস্ত মানুষের, কখনো বা
উড়ন্ত মেঘের ছাপ, পাখির পালক,
কিংবা সিঁদুর-মাখানো কোনো হিন্দুর ঠাকুর...

এতদিন মস্ত কোনো আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকেছি।
কিংবা, যেখানে শুধু মানুষেরা ভিড় করে মাঠের ওপরে।
কিছুই দেখিনি।

ফাঁকফোকরের মধ্যে, শিশির-ছড়ানো কোনো পাথরখণ্ডের দিকে
আপাতত দুচোখ রেখেছি।
সমস্ত জীবন উঁকি মারে॥

জীবন

□

কিছু নড়াচড়া দেখে মনে হয়
সবাই ঘুমের ভেতর থেকে
জীবনের দিকে চ'লে আসতে চায়।
ছোটো ছোটো পোকা, পাতার জঙ্গল ঠেলে
গাছের বাকল বেয়ে এগিয়ে এসেছে।
ওরা ঘোরাফেরা করে। অস্ফুট শব্দ হয়
এখানে ওখানে।
বালকেরা মাঠ পার হ'য়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে যায়।
সমস্ত গানের স্থূল নক্ষত্রলোকের দিকে সংকেত পাঠায়।

এইসব ছড়ানো ছিটোনো
কিছুটা গরম, পাৎলা, ঠোঁটে ঠোঁট লাগবার মতো শিহরণ
রাত্রিদিন কেঁপে কেঁপে ওঠে।
যে তোমাকে বিশাল শূন্যের দিকে প্রতিদিন ঠেলে ঠেলে দেয়,
যে তোমার সর্বস্ব কেড়ে নেবে ব'লে
শাসিয়ে চলেছে,
আজ তাকে বলো:
সব কিছু চলে গেলে, প'ড়ে থাকে অনন্ত জীবন।
এসো, তাকে সাজাই গোছাই।

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

দুর্ঘটনা

□

গল্পের আসর তৈরি, মেঘেরা সবাই চুপচাপ
বৃষ্টি হবে আজ সারারাত,
অথচ এখন তুমি স্বপ্ন দেখছ উপক্রুত কৃষি সভ্যতার।
অকৃতার্থ আমি, তবু প্রতিমা উৎকীর্ণ করা আমার চিবুক
ঊর্ধ্বে তুলে ধরি অহর্নিশ।
তুমি ছায়া নও,
তবু অগণ্য ঘাসের বুকে মেঘেদের মালিকানা দেখে ছুটে গেছি।
মেঘেরা অলিভ হাসি না জানলেও অরুণের ছোটমাসি জানে।

যদিও যান্ত্রিক নই, যাতায়াত করি ; চাই তোমার আমূল দানধ্যান
নীলিমা-ঝরানো জল আষাঢ়ে শ্রাবণে কবে জড়াবে রেণুতে ?
তোমার দোপাটি-নাভি-স্থানচ্যুত রাজকীয় রুপোলি নিশান
আমার চিবুক ছুঁয়ে গেলে
'শরীর' শব্দটা ভেঙ্গে দুর্ঘটনা রটে যাবে তোমার নিজস্ব অভিধায়।

ফুলের সংসার

□

আমি চাই সামনের পথটুকু এবার বর্ষায় একটু বিদ্রোহ করুক
এবারও জমবে জল, লেল্যাণ্ডের শিশুবাঘ তর্জনে গর্জনে
কাদা জলে ঢেউ তুলবে, তুমি থেকো বরান্দ জমিতে
ফুলের সংসারে।

পার্কে বসা ভাঙ্গা বেঞ্চ ভিজে জুতো পায়ে
বিদ্যুৎ নেভানো মেঘে ঝামরে জল আসে
প্রফুল্ল কদম্ব বন স্বপ্নের ঘোরে এসে বজ্রাহত থেমে যায়
চায়ের দোকানে।

হস্তদন্ত পাঞ্জাবির ছুটে চলা উড়ন্ত উল্লাসে
দুবেলা মুক্তির কল্প মারা পড়ে বাসের হাতলে।
তুমি শুধু ব্যয় করো কয়েকটা মিনিট
ফুলের সংসারে।

অপেক্ষা

□

বৃষ্টির অপেক্ষায় সারা গ্রীষ্ম কাটল
রোদের কথা ভাবতে ভাবতে হেমন্তের দিন ছোট হয়ে
এসে গেল শীত
তুমি আর মর্মরিত হতে পারলে না।
অসময় হলেও আমি ভেবেছিলাম
প্রকৃতির প্রভাতফেরিতে তোমার দুচোখে দুলবে অসংখ্য ফেস্টুন ;
কিন্তু 'গেল গেল' শব্দ করে শহর কাঁপিয়ে
আমাদের বয়স একটি একটি করে তার পাতা ঝরাতে লাগল।

দুহাতে পশম বোনা বিকেলের কাছে
এখনো সমুদ্র দৃশ্য
মোহনার প্রতিধ্বনি আছে
তোমার ভিতরে কবে বিস্ফোরণ ঘটে যাবে
মাটিকে জড়ানো জলে জোয়ারের আগে ?

চাঁদের প্রবেশ প্রস্থান

□

চাঁদের বিষয়ে কিছু ভাবি না সম্প্রতি।
যাবার বেলায় কেউ 'আসি' বলে, কেউ বলে 'যাই' ;
সে বড় সুখের যাওয়া
বৃষ্টি থেকে পিছু হটে নির্জন রিক্সায়।

চাঁদের যাবার বেলা কেউ কিছু কখনো বলে না
চাঁদের প্রস্থান শব্দ কেউ বুঝি কখনো শোনে না।
আমি তার ব্যতিক্রম নই, বার বার নীলিমায় তাকে একা ফেলে
কাজুবাদামের বনে অনেক ছুটেছি।

সেখানে ভূতেরা লক্ষ্মীছেলের মতন চুপচাপ।
বনবিড়ালের হাঁকে মুরগিরা ভয় পেলে ওপরে তাকাই
সমস্ত আকাশে কোনো স্মৃতিধার্য মেঘ নেই, ছায়াপথ কিম্বা ধূমকেতু
তুখোড় পায়ের শব্দ ছড়িয়ে কখন চাঁদ পালিয়ে বেঁচেছে।

কাটাফল

□

যা কিছু প্রতিভা তুমি তাই :
গ্রীষ্মের অশ্লীল শূন্য গলে গলে মেঘ হয়, আমি বেঁচে যাই
কেন না এখন আর চূড়ান্ত নষ্টামি দেখে তারিফ করি না।
এখন নিঃশর্ত সন্ধি দুপাশের রগে
সাদা পতাকার নিচে পুরু হয়ে গেছে।
যদিও বিনষ্ট মাংসে আজও ঘটে খুচরো বিস্ফোরণ।

অনভিজ্ঞ আমাদের বল্মীকে
তবুই অরণ্য ভাঙ্গা মেঘে মেঘে
তুমি বৃষ্টিপাত,
মেরুদণ্ডে সুরু হয় ক্যালিডোস্কোপিক নলে সুবিশাল খেলা ;
বিশ্রান্ত স্মৃতির জল হুহু রসাতল থেকে ছুঁড়ে দেয় সহাস্য লাটিম
অতর্কিতে টের পাই কিনারাবিহীন ভাবে শিশুকাল বিপুল সুদূর।

'নষ্টামি' শব্দের কাছে কাটাফল চাওয়া আর
আমার সাজে না।

আমাকে বিনাশ করো যদি

□

আমাকে বিনাশ করো যদি
জেনো আমি উদাসীন নই
আমি অপরাধময়তা থেকে নিরাশ্বাস ছুটে গেছি দিগন্ত অবধি।

আমাকে বিনাশ করো যদি
জেনো আমি উদাসীন নই
আমি অপরাধময়তা থেকে পাহাড়ি জলের স্রোতে ছুটে গেছি।

আমাকে আঘাত করো যদি
জেনো আমি
ঘূর্ণিত পতন থেকে নিশান উৎকীর্ণ করা আমার চিবুক
ঊর্ধ্বে তুলে আছি।

আমি উন্মোচনহীন
তবুও কুসুম
পল্লবে পরাগলিপ্ত অতর্কিত গাল মুছে নেয়
আরো বেশি অতর্কিতে তার কামার্ত কেশর
অবসাদে ভেঙ্গে পড়ে নাবাল মাটিতে ;
অরণ্যে গোপন ছায়া গুপ্তবৃক্ষবীজে
আরো বেশি ব্যাপ্ত চরাচর জেগে ওঠে চোখের বলয়ে।

আমি শুধু অপরাধময়তা থেকে
আর এক ব্যাপ্তির দিকে ছুটে যাবো
আমাকে আঘাত করো যদি।

মনীন্দ্র ঘটকের কবিতা

আগমনী

□

নিরন্তর এক শূন্যে জানালা-কপাট
হা হা হাট খোলামেলা—
পোড়ো বাড়ি ভুতুড়ে বাগান
নেপথ্যে মেনকা ডাকে, গৌরী, চলে আয়
নিরন্তর এক শূন্যে জানালা-কপাট
হা হা হাট খোলামেলা॥

অন্বেষা

□

গির্জায় যে ঘণ্টা বাজে
বুকের ভেতরে শুনি
বুকের ভেতর থেকে ককিয়ে নিনাদ ওঠে
সে-সকল গির্জায় যায় না
তারা খোঁজে গির্জার বাইরে কোন্ একান্ত মানুষ॥

জানেনা

□

ওরা সব চলে যায়
আমি তারপর দাঁড়িয়ে এখানে
তারপর তারপরে তারও পরে
কেউ আসবে আমি চলে গেলে

সে কি তুমি?
তুমি তা জানো না॥

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা

পরিধি

□

আকাশ
আছে—
পাখি
আছে—
গাছ
আছে—

সাদা বাড়ি
লাল ঘোড়া
নীল নদী

একটি পোষাক
আছে—
একজন যাত্রী
আছে—
একটি নৌকা
আছে—

মিড়

□

১.
সারাক্ষণ
পদধ্বনি—
কেউ সামনে আসে না
কেউ—

২.
করতলে সারারাত ঢেকে রাখি
করতল সারারাত ঢাকে—

সারারাত
নিজের মুখ করতলে ঢাকি—

৩.
শীতের গাছ
একটি ইচ্ছে
একটি সবুজ পাতা

৪.
সারাদিন
এস্রাজ বাঁধা—
সারারাত
তার ছিঁড়ে ফেলা—

৫.
শব্দ
দরজায় ছুটে যাই
শব্দ
ঘরে ফিরে আসি

৬.
ফুল
গন্ধ
হাওয়া
নেশা
ঘুম

৭.
পাখি
উড়ে যাওয়ার সময়—
পাই—
পাখি
ফিরে আসার সময়—
পাই—
পাখি
দাঁড়ে বসলেই—
পেতে ইচ্ছে হয়—

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

সমকাল

□

লোক-সংগীতের তালে
নেচে চলে যায় দিনগুলো,
তাদের চুল উড়ে বেড়ায় হাওয়ায়।

কে একজন বার বার বদল করছেন সাজ
কিন্তু, গাছের ঘন ছায়ায় গাঁজা খায় উদাসীন সাধু
আর নিশ্চুপ মাটির উপর দিয়ে
পিঁপড়ে সারি বেঁধে চলে যাচ্ছে তার সংসারে।

মাঝে মাঝে মেঘ করে
জল ছল-ছল করে দীঘিতে আর চোখে
পাখিগুলো হঠাৎ করে
ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁকের মুখে গাছটায়।

আর, তখন—
খেয়াঘাটে নোতুন যাত্রীরা এসে দাঁড়ায়
বলে :
তাড়াতাড়ি পার করে দাও—মাঝি,
কাজ পড়ে আছে অনেক।

নিজের কাছে নিবেদন

□

স্যার, আমি বিদ্যা-দপ্তরের কনিষ্ঠ কেরাণী
লক্ষ লক্ষ শাবকের নরম ঘিলুতে ঠাসা ঘর ;
তার মধ্যে আছি ঝুলে
দায়িত্বহীন মাংসের মতন।

কর্মস্থল পার্ক স্ট্রীট
নবাব বাড়ির আমবাগান ছুঁয়ে
বেগম দখিনা হাওয়া ঢুকে পড়ে দুপুরে সন্ধ্যায় ;
উড়িয়ে নিয়ে যায় রোল নম্বর আর ভাগ্য।
পিওন এসে কাঁচ চাপা দিয়ে যায় :

'বাবা, এ দপ্তরে এত নড়াচড়া কেন,
থাকো চুপ-চাপ। বুকের উপর পাথর চাপা না পড়লে
হয় না জ্ঞান, পাওয়া যায় না চাকরী ;
যায় না বাঁচা।'

বার বার নিজের ছেলেটার কথা মনে হয়—
শিক্ষা-দীক্ষা দিচ্ছি ভালোই। পড়ে ইংরেজি
পড়ে না মাটিতে পা।
বার বার বলি :
'পড়ো বাবা, পড়ো ;
বই তোমাকে ঢেকে রাখুক যাবৎ জীবন।'

অর্থাৎ ক্যাপস্থল
keep in a dark and cool place

তারপর একদিন
ফরম্ ফিল্-আপ করে দিয়ে
তোমার ঘিলু জমা পড়বে তোমার বাবার দপ্তরে।
কয়েকজন বিচারক রহস্যময় গাড়িতে নেমে আসবেন
নোংরা কাগজে মুড়ে নিয়ে যাবে লদলদে বস্তুটুকু।

এবং তিন মাস পর
তাকে শুষ্ক করে দিয়ে তৈরী হবে একটা নির্লজ্জ কাগজ।

মনুষ্যত্ব

□

হাওয়া বইছে এলোমেলো। মেঘের রাজ্যে ভাঙ্গ-চুর আর
উত্থান-পতন। বৃদ্ধ নক্ষত্ররা গালে হাত দিয়ে ভাবছে ;
মাটিতে তার চিন্তার রেখা বিস্তারিত সমুদ্র পর্যন্ত।

কিন্তু, কে ওই দীর্ঘ-দেহী দাঁড়িয়ে আছে যীশুর মতন
সর্বাঙ্গে যাঁর বিঁধে আছে কালান্তক কাঁটা ?

কে তুমি ?
—প্রশ্ন করতেই সময় বিচারকের মত তর্জনী তুলে বলল :
—তুমি নিজে।

—আমি ? আমি তো বেশ আছি। নিবিরোধী, শান্তিপ্রিয়, সুখী।
আমার সংসার ঘিরে চতুর্দিকে চড়াই-পালক আমি
সাত চড়ে রা-করি না ; আমি বিধানসভা আর লোকসভার
ঝাড় লণ্ঠনের নীচে দাবা খেলছি দিব্যি !

অথচ সময় এখনও নামায়নি তার তর্জনী।

হে সময়, হে বিচারক, তুমি তো অপরের দাসত্ব কর না ;
তুমি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার মোহে নিজের মাংস খাও না।
তুমি আমাকে যে ভয়ঙ্কর রূপ দেখালে
তার অর্থ কি ?
—সত্যিই আমি এই ?
—এই আমি ?
—এই ?
সময় কি যেন বলছিল মনে মনে ;—শোনা গেল না ;
হাওয়া শুনতে দেয় না ; গাছ-পালা গোলমাল করে ;
আর, ছায়া পথের উপর থেকে বকুলের মত কি যেন কুড়িয়ে তোলে আঁচলে।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

আমি জানতাম

□

আমি জানতাম আপনাকে এইদিকে আসতে হবেই
একদিন আপনার সঙ্গে দেখা হবে বাস স্টপে
হঠাৎ প্রদর্শনীতে
আমরা ভুলে গেছি কবে আমরা তুমি বলতাম এ ওকে
কবে আমরা প্রায় যেন এক ছিলাম
জলের ভেতর পা ডুবিয়ে মুখ দেখতে গিয়ে
দেখতাম ঢেউয়ের দোলায় একটিই মুখ
সে ছিল আর এক দিন···
এই মুহূর্তে আপনি এবং সবাই ফিরছেন
কোনখানে কত দূরে
মানুষ কতটা দূরে যেতে পারে
ঢেউয়ের দোলায় দোলায় ফিরে আসছে
মানুষের নিরন্ত বিশ্বাস।

বাণিক রায়

ভালোমন্দ

□

হে রাজকুমার, ছাখো, চোখ খুলে তাকাও এখন :
তুমি আর রাজা নও, এই উঁচু ভুটান পাহাড়ে
রঙবেরঙা ভুটানি জড়িয়ে, হাতে বর্শা,
ওপরে দেখছ নীল আকাশ, তোমার ঠিক নীচে
পাহাড়ী পাথর শক্ত, দুরন্ত স্রোতের শব্দে নদী
স্বচ্ছ জলে ঢেউ ভেঙে উপল আঘাতে
আকাশের নীল আশা নিয়ে ছোটে
অনন্ত জলের দেহে, দিগন্তের কোথায় কোথায়
জলের শরীর জলে একটি স্রোতের রেখা হয়ে
সূর্যের আলোয় কাঁপে গাছের ছায়ার স্বপ্ন নিয়ে।
তুমি নীচে নেমে এসো, কাছে আসতে চায়না কেউ
পাছে তুমি দস্যু হয়ে লুটে নাও পথিকের সর্বস্ব ;
সকালের রোদে তুমি খুলে ফেলো পোশাক তোমার,
ভাঙা নড়বড়ে তাঁর ভেঙে দাও প্রচণ্ড লাথিতে,
তোমার শরীরে আলো পড়ুক সূর্যের, ভালোমন্দ
মানুষ শহরতলী থেকে পালিয়ে এসেছ তুমি
নির্বাক দর্শক হয়ে পাহাড়ের নির্জন তাঁবুতে ;
মহাকাল থেকে দূরে শুষ্কা রাত্রে প্রতিধ্বনি ক'রে
তোমাকে জাগাতে চায় ; কি দেখছ আকাশে আঁধারে
দেহে পেরেকের মতো দিনরাত্রির বিচিত্র রঙ ?
নির্বাক, বধিরও কি ? এই স্বচ্ছ স্থির বিন্দু থেকে
তোমার স্ত্রী অর্ধ নগ্ন হয়ে বুনো মরিচ তুলছে একা
সরস্বতী নদীতীরে পাহাড়ের গায়ে, আর তুমি
ছানায় মিশিয়ে খাবে ; ঝালে তোমার পরম স্বাদ !
মৃত্যুর মতন কালো রঙের তোমার গোরুগুলি
পাহাড়ের পথে তীরে চরে ঘাস খায়, জলে নামে।
ত্রিস্রোতা নদীর শব্দ পৃথিবীর ভালোবাসা হয়ে

মাটিতে তৃণের মধ্যে পাহাড়ে বাতাসে গাছে গাছে
আদরের গান তোলে নিহিত মৃত্যুর স্পর্শ নিয়ে।

কিসের প্রতীক্ষা করো, কার অপেক্ষায় বসে আছো।
মনের ভেতরে শুধু তোমার চঞ্চল অস্থিরতা,
কি দেখছ চারদিকে তারকা ঘুরিয়ে এ নির্জনে
মাথায় আকাশ নিয়ে, তোমার ইচ্ছায় মিশে আছো,
নিষ্ক্রিয় নির্বাক তুমি, তোমার সংসার ঠিকই ঘোরে,
বিচ্ছিন্ন, অথচ তুমি সকলকে চাও, আলিঙ্গনে
পেতে চাও গাঢ় রঙে, রাখতে পারো না তুমি, হায় !
শূন্য অন্ধকারে এই জগৎ-সংসার তোমারি স্ত্রী
ঘুমিয়ে পড়লে তুমি নিস্তরঙ্গ আকাশের নীচে
তারার আলোক জ্বেলে দুঃখে কিসের প্রতীক্ষা করো,
কোন্ অন্তহীন দুঃখ তোমাকে জাগিয়ে রাখে !

পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে নীচ থেকে পলকে দেখেছি
আমাদের ভালোমন্দ তোমার ভেতরে ডুবে যায়—
রহস্য ও ভয় চোখে আঁধার তৃষ্ণার ব্যাকুলতা।

রত্নেশ্বর হাজরা

উত্তাপের কাছেই

□

ওরা বলে—নাকি ওখানে কোথাও তাকে দেখা যায়—**তার**
সাথে কথা হয় ওখানেই নাকি গভীরে কোথাও
তার বাসভূমি রাজপাট তার
অতিথিশালায় মহা আয়োজন—নীল সামিয়ানা
মাথার উপরে
নিচে মহাসভা। বরফের মতো
হিম জলবায়ু
অচেনা ভূগোল.....
এবং ওখানে
রত্নের লোভে নিচে নামে মেধা। মহান সত্রে
মঙ্গল হয়ে দুঃখেরা ঘোরে। দিন ও রাত্রি
সম-আলোকিত তখন থেকেই
জল নিয়ে মেঘ আমাদের দেয় পুকুরে দিঘিতে।
পৃথিবীর শীতে
অগ্নির খুব প্রয়োজন, তবে ওখানের হিমে
উত্তাপ কোনো প্রয়োজন নয়—
ওরা বলে—নাকি
ওখানেই তার সাথে দেখা হয়
পরিচিতদের সঙ্গে—ওখানে
হিম জলবায়ু রেখেছে শাসনে বুড়ো পুরোহিত
ওখানেই নাকি যতো দিন যায়—ততো দিন যায়
ঘন হয় শীত
শাদা শাদা শীত
শীত শুধু শীত···

অপূর্ব মুখোপাধ্যায়

কৃষক

□

সবুজে হাওয়ায় মিশে শস্যক্ষেতে বেজে ওঠে গান
রোদের আশ্বাস তার এনে দেয় ফসলের দিন
সম্পদ ছড়ানো মাঠে, আমাদের সমৃদ্ধির পথ
শস্যকণা হেঁটে যায়, সঙ্গে তুমি সমস্ত প্রহর।

শস্যক্ষেতে তোমাকেই সবচেয়ে অধিক মানায়
যদিও দরিদ্র বেশ, তারই মধ্যে রাজেন্দ্র পোষাক
উজ্জ্বল আয়ুধ এক কাস্তে শুধু, অহংকারহীন
মুখে রোদ ঝলকায়, বৃষ্টি ঝরে আষাঢ় শ্রাবণ!

এত অনায়াস ছবি, আঁধার আড়াল তবু তার
তাকে ঘিরে নিঃস্বতা, নিপট ক্ষুধার বেড়াজাল
অথচ দাঁড়ালে মাঠে সবুজে হাওয়ায় শুধু গান
এবং সুবর্ণ দিনে মুকুটবিহীন সম্রাট!

আড়াল কি ছিঁড়বে না! নিজের আগুনে অন্ধকার
মুছবে না! সিংহভাগ কতদিনে তোমার একার!
দর্পিত পায়ে কেঁপে উঠবে না সবুজ স্বদেশ
অহংকার তুলে নেবে ধুলো নেড়ে কবে, হে কৃষক!

শস্যক্ষেতে তোমাকেই সবচেয়ে সঠিক দেখায়
তোমার অসাধ্য নয় সত্যকার রাজন্যের বেশ
তোমারইতো জন্যে গান সবুজ হাওয়ায় সমবেত
সুবর্ণ ধানের মধ্যে খুঁজে নাও অম্লান মুকুট!

মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

বৃহন্নলা

□

আর কেন এই অজ্ঞাত বাস
দারুণ ক্রোধে নিত্যজ্বলা ?
হাড় পাঁজরে বজ্র পুষে
চমক হানে বৃহন্নলা।

বৃহন্নলার বোরখা ছিঁড়ে
বেরিয়ে পড়ে তীক্ষ্ণ শরীর
কীচক বধের পর্ব শুরু
আচম্বিতে এই রমণীর

এই রমণীর নীল ধমনী
ধৈর্য ধরে গুণছে প্রহর—
শিরায় শিরায় গর্জে বারুদ
তুলছে সাগর হাজার লহর।

ফুঁসছে রোষে কালনাগিনী
সব ইতিহাস রাখছে লিখে—
লাল আগুনের ফুল্‌কি দিয়ে
উল্কি সে দেয় পাঞ্চালীকে।

আর কত দিন শপথ নিয়ে
মশাল হয়ে নিত্য জ্বলা ?
বিস্ফোরণের লগ্ন আসে
দিন গুণে তাই বৃহন্নলা।

শ্যামল পুরকায়স্থ

ধীমান ও প্রগতির রূপকল্প

□

পাঁচটি আঙুলে ধরো তরতাজা সকর্মক ক্রিয়া—
হাট থেকে বেছে ফ্যালো শাক-সবজি, ফলমূল
স্নেহজাতীয় বস্তু, আমিষ দ্রব্যাদি।
চাই কি মশলাপাতির ফর্দে নুন-লঙ্কা-গোলমরিচও—

লোকস্বীকৃত এই বেদবাক্যে সকর্মক ক্রিয়াগুলো কেন্দ্রাভিগ।
জানা কথা, সৌর-কুসুমে প্রচ্ছন্ন আশিস :
সামাজিক লাবণ্য, সুখের জগৎ।

তবু একী ! আবহাওয়া ভাষণে কোন দুর্নিবার ভ্রম—আন্তঃঝড়ে
স্মৃতি-স্থিতির মানচিত্র বদলে যাচ্ছে
ধস নামছে দুরন্ত বেগে। ধীমান ও প্রগতির আলেখ্যে ইতি !
প্রতিষ্ঠানচ্যুত বিমূঢ় মানুষ খড়কুটো হাতড়ে বেড়ায়—
ওদিকে কেবল দীর্ঘসূত্র প্রতিবন্ধকতা—কারণের ছুতো নিয়ে
সংঘ ব্যবসা !

আমি চলচ্চিত্রকার হলে সামগ্রিক প্রয়োজনে
প্রতীকী বিন্যাসে মগ্ন হতাম, হয়তো দেখাতাম—
তুষারপাতের মধ্যে দুর্লভ কাঁচঘর ঝনঝনিয়ে ভাঙে।
তারপরই জাম্পকাট। ক্লোজ আপে কল্পতরুর কঙ্কাল।
তাতে ঠিকরে পড়ছে মশালের ভৌতিক আলো।
এবার ডিসলভ হতে-হতে পর্দার অর্ধাংশ জুড়ে অন্ধকার
প্যালেটের আকৃতি পায়।
বাকি অর্ধাংশে প্রায়োন্মাদ শিল্পী মাথা ঝাঁকিয়ে বকে চলেছেন :
মৌলিক রঙগুলো লোপাট করেছে সে—
বন্দী করো তাকে।

দুঃখের প্রস্রবণে ভেসে-ভেসে দুঃখ ভুলতে পারে কেউ ?
অদূরে মোহানার হাতছানি—
অপটু গৃহস্থ পরিত্রাণ পেতে চায় খিড়কি পথে !
অসম্ভব প্রত্যাশা।
সেখানেও সুদখোর পলাতক লোকটিকে তাক করছে
পাঁচ আঙুলে বল্লম উঁচিয়ে।

মলয় ঘোষ

কথা আছে

□

বেলা শেষে দূরাগত কোন ট্রেন ছেড়ে গেলে
অকস্মাৎ কথা আছে, কথা আছে, মনে হয়
হা-হা বুকে জ্বলে যাই পুড়ে যাই কি যে
এ বয়সে আর কাঁদা যায় না কখনই নিজে
ঘুম নেই, ঠায় জেগে থাকি রাতের ভিতর
কথা আছে, কথা আছে যেন এমনই সময়

কথা তো কতই আছে ফুলেদের কোরকে
কথা তো কতই আছে চতুষ্পদী জন্তুর মুখে
কথা আছে সূর্যের বীজে, গ্রানাইটের স্তরে
কথা আছে অরণ্যে অরণ্যে, সমুদ্রের গভীরে
কথা তো আমারও আছে তালাবন্ধ বুকে

কথা আছে এ সময়, কথা থাকে দুঃসময়
সব কথা রয়ে যায়, বলা হয় না তোমাকে…

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

কেন কবিতা লিখি না

রাঢ় বঙ্গ কবিদের পুণ্যভূমি। এই স্নিগ্ধ ও নম্রপ্রাণ দেশের যেদিকেই যাই সেদিকেই কবিতা ফসলের জন্য উর্বরতা লক্ষ্য করি। নবদ্বীপের বাতাস এখনো বুঝি বৈষ্ণব কবিদের শ্বাসের বায়ু বহন করছে। ভাগ্যতাড়িত মুকুন্দরামের পরিক্রমার পথ এখনো কি স্মরণ করে না তাঁকে? বুকে অলৌকিক একটি কবিতা উৎকীর্ণ পাথর নিয়ে অনন্ত শয়ানে মাইকেল আজও পুরোনো হলেন না! আমাদের দৈনন্দিন বাক্যবন্ধে অবচেতনেও বার বার হানা দেন ঈশ্বর গুপ্ত, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ। গোটা একটা জাতের ব্যক্তিত্বকে আজও কথঞ্চিৎ নিরূপণ করে দেন চারণ রবিঠাকুর। কবিতার নিস্তব্ধতা নিয়ে মৃত্যুর পরপার থেকে আজও আমাদের নির্জন জানালায় উটের মতো গ্রীবা বাড়িয়ে দেন জীবনানন্দ। কবিতায় সাঁতার শেখান সুধীন্দ্রনাথ, দ্রাক্ষাপুঞ্জ থেকে সুরা—অর্থাৎ সমগ্র সত্তা নিংড়ে কবিতার বিন্দু সৃষ্টির কৌশল শেখানো অব্যাহত রেখেছেন বুদ্ধদেব। ক্ষুরধার বিষ্ণু দেও তো বিস্মৃত নন।

কবিতার কাছে আমি কতদূর ঋণী তার হিসেব আজও করিনি তো! আমার শৈশব চেতনাকে প্রথম প্রস্ফুট করেছিল মায়ের মুখ থেকে শোনা রবি ঠাকুরের কবিতা। মহুয়া, চয়নিকা। আলোকের সেই ঝর্ণাধারায় ধুয়ে গেছি বারবার। কবিতার হাত ধরে বড় হয়েছি। হতে হতেই পথে একদিন ভবানী পাঠকের সঙ্গে দেখা। অবিকল ভবানী পাঠক, অর্থাৎ ডাকাত বংকিম। ব্যর্থ কবি কিন্তু সফলতম গদ্যকার। আমার গা থেকে কিছু কবিতার খড়ি উড়িয়ে দিলেন কুলোর বাতাসে। ঘাড় ধরে বসিয়ে দিলেন গদ্যের সাড়ম্বর ভোজে। কিছু খারাপ লাগেনি। তারপর থেকে দুই ঘোড়াই আমার গাড়ি টেনেছে।

প্রেমাংকুর আতর্থীর মহাস্থবির জাতক যাঁরা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পড়েছেন তাঁরা আমার মতোই ভুক্তভোগী। তাঁরা জানেন, সাদামাটা গদ্য কেমন কবিতার যাদু বিকীরণ করে। জাতকের ভূত আজও আমার ঘাড়ে বসে ঠ্যাঙ দোলায়।

বলে রাখা ভাল, এ সবই ছিল আমার বাল্য ও কৈশোরে পঠিত।

তারাশংকর বা বিভূতিভূষণ পড়তে শুরু করি সাত আট বছর বয়সে। আর পড়তে পড়তে ভিতরে ভিতরে এক নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হতে থাকে। কিংবা বলা যায় সেটা ছিল এক স্বপ্নেরই শুরু।

সত্য বটে আমি কবিতা লিখি না। কিন্তু গদ্যও কি লিখি? একটু আধটু লেখালেখির চর্চা করলেই লেখকের দাবি জন্মায়? ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত আমি সাহিত্যের এক বিমুগ্ধ পাঠক। কিছুটা অপরিণত, কিছুটা অপ্রখর বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন এবং ভাবাবেগতাড়িত। বছর দশেক আগে একদিন মেসবাড়ির নিজস্ব নোংরা তেলচিটে বিছানায় শুয়ে এক শীতের বিকেলে পথের পাঁচালী পড়ছিলাম। ইন্দির ঠাকুরুণের মৃত্যুর বিবরণ পড়তে গিয়ে বুকে মেঘ করে এল, চোখ ভেসে গেল জলে। পড়তে পড়তে দুর্গা বই ছেড়ে বেরিয়ে এসে চিকন স্বরে ডাক দিল—অপু! এই অপু! হাঁদা কোথাকার!

সাড়া দিলাম—কীরে দিদি!

কয়েক পৃষ্ঠার পর সেই দুর্গা দুর্যোগের রাতে যখন পৃথিবীর মায়া কাটাচ্ছে তখন তীব্র বিষাদ, অপ্রতিরোধ্য কান্নায় আমি মেসবাড়ির ঘর ছেড়ে প্রায় ছুটে বেরিয়ে পড়ি।

এ পাঠককে কি কখনো পরিণতমনস্ক বলা যায়? মধুসূদনের এপিটাফ পড়লে এখনো গলায় আবেগের দলা ঠেলা মেরে ওঠে যে! কি করি!

সুতরাং নিজেকে এক দুর্বলচিত্ত বাঙালী পাঠক ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না। আট দশ বছর বয়সেই একটা মোটা বাঁধানো খাতায় বংকিম আর রবিঠাকুরের অনুসরণে গদ্য পদ্য লেখা শুরু হয়। সেটা কোনো বিচিত্র ঘটনা নয়। প্রায় সকল ভাবপ্রবণ বাঙালী বালকই তা করে থাকে। তাতে কোনো উচ্চাশার বীজ উপ্ত ছিল না বোধহয়, না ছিল তাতে একমুখী কোনো টান। ফুটবল, ক্রিকেট, ডাংগুলি, ছবি আঁকা বা লেখা তখন সেই শৈশব বয়সের বিচিত্রমুখী আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাকেই প্রশ্রয় দিত মাত্র।

অসহায় কিশোরের বিহ্বল মাথাটিকে দখল করার জন্য অনেকেই ছোঁ মারত তখন। সাহিত্যে শিকারী বাজপাখীর তো অভাব নেই। বংকিম, রবিঠাকুর, বিভূতিভূষণ এবং কে নয়?

কিছুকাল আগেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বংকিমকে এক হাত নিয়েছেন। মনে হয় সুনীল সবটাই অন্যায্য কথা বলেননি। কিছু কটূকাটব্য কি বংকিমের পাওনা নয়? যেমনটা বুদ্ধদেব বসুও করেছিলেন মাইকেলকে। বুদ্ধদেবকেও

একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় নি। আর এই তো প্রথম নয়, বংকিম, মধুসূদন প্রমুখকে কতবার না কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিজেদের বিরুদ্ধে রায় শুনতে হয়েছে। সুজিত সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের চারদিকে কালো মেঘের দলের কথা লিখেছিলেন, যা পড়ে দুর্ভাগা রবি ঠাকুরের ওপর মায়া হয়।

কিন্তু তবু কী করে যেন বংকিম, মধুসূদন, রবি ঠাকুর থেকেও যান। সমস্ত গলাধাক্কা, নিন্দেমন্দ উপেক্ষা করে। কাঁঠালের আঠার মতো, দোলের বদ রঙের মতো, অভ্যাস বা সংস্কারের মতো লেগে থাকেন। যতই গাল দিই, ফের বিরলে বসে বিষবৃক্ষ পড়তে পড়তে সময়ের প্রবহমানতা উজানের দিকে ছুটতে থাকে।

যতদূর মনে পড়ে সেই বাজপাখিদের মধ্যে বংকিমই সবচেয়ে সফল ছোঁ মেরেছিলেন। গদ্য আর বংকিম তখন প্রায় এক ও অভিন্ন। নিপুণ চাষার মতো তিনি গদ্যচর্চার বীজ বুনে দিলেন মনের মধ্যে। তা বলে আগাছা ভ্রমে কবিতার তৃণাংকুরগুলিও উৎপাটিত করলেন না। চাষা জানে, শস্য-ক্ষেত্রের তৃণগুল্মই তার সবচেয়ে প্রাথমিক সার। তাই কবিতাও থেকে গেল সার ও জলসেচের জন্য।

বাঁধানো খাতায় তাই ক্রমে ক্রমে জমে ওঠে গদ্য আর গদ্য। কিছু নয়, ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যহীন। তবু গদ্যই।

তবু বলি সে বয়সে লেখক হওয়ার তেমন কোনো সাধ ছিল না, কবিত্বের আকাঙ্ক্ষাও ছিল না গুরুভার। লঘুপক্ষ প্রজাপতির মতো মাঝে মাঝে দু-একটা রঙীন আকাঙ্ক্ষা উড়ে আসত ঘরে। চলেও যেত। কিন্তু উৎকর্ণ ছিলাম বরাবর। বহু অন্যমনস্কতার মধ্যেও নেপথ্যে সাহিত্যের স্রোতশব্দ শুনতে পেতাম। নিরাকার এক অঙ্গুলি নির্দেশ সেই দিকেরই হদিস দিত।

কেন কবিতা লিখি না কিংবা গদ্য লেখার জন্যই বা মাথার দিব্যি দিয়েছিল কে, তা কি করে বলি! তবে এটা জানি আমার লেখালেখি গৌণ, বরং পড়াটাই অনেক বেশী গুরুতর ছিল এবং আছে।

দোতলা বাসের সীটে পাশাপাশি বসে বহুদিন আগে একদিন কবি উৎপল কুমার বসুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনি গল্প-টল্প আর লেখেন না কেন? ভারী ভাল ছিল আপনার গদ্য লেখার হাত। জবাবে উৎপল বলেছিলেন "আসলে কবিতার ব্যাপারটা বুঝে যাওয়ার পর গদ্য লিখতে ইচ্ছে করে না।" কবি সুনীলও মাঝে মাঝে যেন বলেছেন যে তিনি মূলতঃ কবি।

গদ্যে তাঁর মনোযোগ অথও নয়। হয়তো গদ্যে তাঁর বিপুল খ্যাতিকেও তিনি ততটা আমল দেন না। শক্তি যদি লিখতেন তবে মনে হয় বাংলা সাহিত্যের গদ্য চর্চায় এক বিপুল আলোড়ন ঘটতে পারত। তাঁর উপন্যাস কুয়োতলা এবং বেশ কয়েকটি ছোটোগল্প পড়লে পাকাপোক্ত কথাশিল্পীরও কলম পড়ে যাওয়ার কথা। তাহলে শক্তি বা উৎপল গদ্য লেখেন না কেন এ কে সঠিক বলবে? সুনীলই বা গদ্যকে কেন বিমাতার আসনে বসান? আমি এঁদের সমান আসনে বসবার যোগ্য নই। তবু কুণ্ঠার সঙ্গে এঁদের উল্লেখ করছি এ কথাটাই বোঝানোর জন্য যে, আমার কবিতা না লেখার কারণটা অনেকটা তাঁদের গদ্য লেখা না লেখার মতোই।

নিজের কথা বলতে কিছু কুণ্ঠা আমার বরাবর। আসলে, কেনই বা নিজের কথা বলা? কে শুনবে? কেনই বা শুনবে? যা কিছু লিখি তার জোরে নিজেকে লেখক বলে দাবি করা যায় বলে মনে হয় না। আর এ সামান্য চর্চাটুকু বাদ দিলে আমি নিতান্তই সাদামাটা নিজের কাছেও। সাত-কাহন করে তবে এই আত্মকথন কেন? বলতে হল নিতান্তই সম্পাদকের উপরোধে।

কিন্তু বলাও হল না ঠিক। কত কি অকথিত রয়ে গেল। কবিতা কেন লিখি না এ প্রশ্নের সত্যিকারের জবাব হওয়া উচিত—লিখতে পারি না। লিখতে জানি না। তবে ভালবাসি। বড় ভালবাসি।

কবিতা সিংহের কবিতা

জ্যোৎস্নায়

□

ঠিক তেমনি জ্যোৎস্না কার্নিশে নীলাভ ছায়া
ঘুম ভেঙে ঢুলতে ঢুলতে দরজা খুলে দাঁড়ানো
ঠিক তেমনি হাস্নুহানা
জ্যোৎস্না মাখতে মাখতে কি যেন স্বপ্নে কষ্টে সদ্যজেগে ওঠা
মাতৃ-হারা

থোপা থোপা কোঁকড়া চুল শরীরে কিন্নর গন্ধ
সঁপে দেওয়া আশরীর নির্ভরতা মা

এবছরও হাস্নুহানা প্রবল হয়েছে।

অভ্যাসবশত জেগে ওঠা

যেন জ্যোৎস্নায় কোনো আহ্বান দুলে উঠ্‌ছে!
এবছরও কার্নিশে নীলাভ ছায়া

দরজা খুলে দেখি
ভাঙা ডিশের মত জ্যোৎস্নার টুক্‌রো ছড়িয়ে দিয়ে কেউ চলে গেছে।

টোকাহীন সদর দরোজা নীরেট অপ্রত্যাশ।

কত জন্ম কত জন্ম এইভাবে একা দুজনের জন্য জ্যোৎস্না সহার জন্য এই
মানব-জীবন।

কেন ভাঙি

□

কেন ভাঙি ? ভেঙে যেতে চাই ?
আসলে কি ভিতর ভিতর
চাওয়া থাকে ?
ভেঙে যেতে চাওয়া—তাই ভাঙি ?
ভাঙি শুধু ভাঙার ব্যথায়।

কেন ভাঙি ? তাও কি বোঝো না ?
অবনত হলে তবে মাটির সমস্ত গন্ধ আসে
মাটিতে যে তুমি মিশে আছো
ধুলায় মুখের রেখা মুছে যায় মুছে মুছে যায়
মুখ ঘষি রক্তমুখ ঘষি
টকটকে বিকাল ঝোলে কাটামুণ্ড রক্ত ঝরে শুধু
কে বলে গোধূলী

মুখ ঘষি হে ঈশ্বর আর কতো ?
আরো কত ?

দিন যায়। দিন চলে যায় !

ব্রততী বিশ্বাসের কবিতা

নির্বন্ধ শিকার

□

আলোর দুপুরে ঘুরে গ্যাছে শঙ্খচিল।
মায়াবী বাতাস গুপ্তমন্ত্র জানে।

তুমি নির্জনতা বেছে নাও
আমাকেও খুঁজে পেতে হবে
প্রাচীর আড়াল
মুদ্রার ওপিঠে তোমার নাম
আমি অন্যপিঠে
আমরা দেখবো না মুখ পরস্পর
এভাবেই দিন যাবে
কোনোদিন এসো না আমার বাগানে
তোমার পাহাড় নদী তোমারই থাক
সমস্ত অরণ্য জেনেছে
স্রোতহীন আমাদের হাসি
দুঃখহীন আমাদের দুঃখ
আমাদের শোক স্তব্ধ গাছ নয় যখন
কেন হেঁটে যাবো জ্যোৎস্নার গহ্বরে
মুখোমুখি
মানায় না এসব আর
সুপ্রাচীন প্রেম নাম যার

ভুলে গেছি শঙ্খচিলের দুপুর
মায়াবী বাতাসের গুপ্তমন্ত্র
প্রতিদ্বন্দ্বী নিষাদের মতো
তুলেছি কিরীচ
নির্বন্ধ শিকার ভালোবাসা।

আমি যাবো আকাশ ঝরনার স্নানে

□

শরসন্ধানী হাত তুলে নিয়ে
চক্ষু তারকা আকাশ
খুঁজে ছাখে
কোনো স্বর্গ প্রেম সকালের হিরণ্ময় উদ্ভাস
ধরা ছোঁওয়া যায় কি না
অবিশ্বাস হানা দ্যায় গোপন মূর্তির ছদ্মবেশে
তখনই অমরাবতীর পারিজাত ভুলে ছুঁয়ে ফেলি
কিশোরীর চুলের মতো গাঢ় দুঃখ
ঢেকে রাখে কপোল লালিমা
একা ঘরে বন্দী হয়
আলোর বাগানের ফুল
মণিকাঞ্চনময় আকাশে আছে
গোপন সংবাদ কণা
যার বিনিময়ে তাচ্ছিল্য করবো আমার
সযত্ন আবাস—ভিটেমাটির শেকড়ের রস
ইতিহাস সুতোর বলের মতো খুলে যাবে
আলোর প্রহারে।
আমার আকাশে আছে আমার জন্মের
নক্ষত্রমালা
বলে দেবে কোথায় সেই
পারিজাত উদ্যান
মৃগয়া পরিত্যাগ করেছি
রুচি নেই রক্তপাতে
পায়ের নীচের মাটি যদি গুপ্তচর হ'য়ে
হানা দেয়
আকাশের সংকেতবার্তা পাঠাবে
আমাকে সহস্রযোজন দূরত্বের কাছে

আমার নিজস্ব মাটির
নিপীড়নে
আমি যাবো আকাশ ঝরনার
স্নানে।

পরমেশ্বরী রায়চৌধুরীর কবিতা

বিকেলে

□

সমস্ত বিকেল থেকে এই ফিরোজা বিকেল
আলাদা
এই সব বিকেলেই নীলচে রঙের পাখিরা উড়ে যায়
এই সব বিকেলেই কৃষ্ণচূড়া গাছ থেকে রক্ত ক্ষরণ হয়
সূর্য ফিকে হতে হতে মিলিয়ে যায়—

ছিয়াত্তর নম্বর বাসের মাথার ঈগলটা
আমাকে ঠোক্‌রাতে আসে!

এইসব বিকেলেই আমি একটা ট্রেনের শব্দ পাই—

এইসব বিকেলেই সব লাল সিগনাল সবুজ হয়ে যায়!

অদরকারী কাগজ ডাষ্টবিনে ফেলার আগেই উড়ে যায়!

অশুভ-বেনারসী

□

রাত্তিরের অন্ধকারে ঝলমলে তারা
স্তব্ধ কালো আকাশটাকে
আমার একটা অশুভ-বেনারসী মনে হয়।

আলোক সরকার

অকম্পন

□

অপরিস্রুত বিরাম গা এলিয়ে শুয়ে আছে
আর ওই সায়াহ্নবেলা
আস্তে আস্তে মাখিয়ে দিচ্ছে তমসা, আস্তে আস্তে
আড়াল করছে প্রস্তুতি।

পাতার প্রবীণতা ক্রমঅপসৃত পরিশ্রম
হেমন্তবেলার পাতা;
লাল ধুলোর প্রৌঢ়তা, বুড়ো ইঁদুরের কুটিল
ক্রমঅপসৃত পরিশ্রম।

অকলুষ একটা নিস্তব্ধ আর ওই সায়াহ্নবেলা
আঁধারময় সর্বস্বতা
আড়াল করছে প্রস্তুতি আড়াল করছে প্রসাধন
অভিজ্ঞতা আর নৈপুণ্য।

কেবল একটা জাগ্রত অকম্পন আর ঋজু
শীতল আর বিস্তীর্ণ আর অপ্রয়াস
দেখো ওই অসংকোচ অপরিশীলিত মিলন
হয়ে উঠছে প্রস্তুতি।

অপরিস্রুত বিরাম আর এই সায়াহ্নবেলা
আঁধারময় সর্বস্বতা।
দূরশ্রুত শঙ্খধ্বনি মর্মর আর গুঞ্জন আর ছায়াশরীর
আর সেই অকম্পন।

ফণিভূষণ আচার্য

অশ্রুসিক্ত অভিমান

□

যখন সকাল হবে ধনিষ্ঠা নক্ষত্র কম্বল টেনে নেবে গায়ে
আলো ফুটবে কলুটোলায় স্কুল-ইউনিফর্ম গায়ে
আঁটোসাঁটো বালিকারা ছুটে পার হয়ে যাবে জেব্রাক্রশিং
এবং উটের কুঁজের মতো গার্হস্থ্যবিজ্ঞানের রাশভারী সাঁকো
তখন কোন গোপন প্রেমের খোঁজে কলকাতার বুক খোঁড়াখুঁড়ি
চলতে থাকবে কালীমার্কা উপন্যাসে

গঙ্গায় বান এলে সদ্য যুবতীরা সাজতে বসে যায়
ট্যুরিস্ট ব্যুরোর বিজ্ঞাপনে ভেসে আসে অতিথি হাঁসেরা
হাসপাতালের ধারে পড়ে থাকে এ জন্মের আর্ত অপরাধ
আমার মার্জনা চাইতে কোনও মন্দিরে যাওয়া হলোনা
রাজধানী এক্সপ্রেস ছেড়ে যায় বেদনার মাদল বাজিয়ে
করুণ রাস্তার কলে এরপর মায়ের কান্নার মতো
জল আসবে দেখো

কফি হাউসের নিচে আকবর মিঞা ধারে সিগারেট বেচে
বাসের নিঃসঙ্গ ভিড়ে সাহস করে কোনদিনই
আমার টিকিট কাটা হয় না
যে রাস্তায় কাল গেছি আজ তাকেই বড়ো অচেনা মনে হয়
শহরতলির ট্রেন গলা ছিঁড়ে নাম ধরে ডেকে যায়
রক্তমাখা হৃৎপিণ্ডের দিকে
এরপর ফুটপাত ছাপিয়ে জল বাড়তে থাকবে বিপদসীমা পেরিয়ে

তখন আমার কথা কি তোমার মনে পড়বে না কলকাতা

জগন্নাথ ঘোষ

নিয়ত তোমার কাছে

□

নিয়ত তোমার কাছে হাত পাতি,
পাততেই হয়।
না হলে দারুণ দহন
প্রাণঘাতী মৃত্যুর দালাল
আমাকেই আষ্টে পৃষ্টে ছিঁড়ে খুঁড়ে খায়।
যখন একেকটি করে শব্দের প্রতিমা
আমার দুয়ারে এসে দাঁড়ায় সংযত
কিংবদন্তীর মতো বলে উঠি
এসো, আমার ঘরে এসো চলে।
অনায়াসে বুঝে ফেলি,
মহাজনী কারবারে কেমন উঠেছ তুমি ফুলে ফেঁপে।
দ্বিধাহীন গেরস্থের মতো
তাই,
কেবলই তোমার কাছে হাত পাতি।
পাততেই হয়।
সংসার অচল হলে
নিরন্ন উপোসে যদি গলাবুক খাঁ খাঁ করে ওঠে
করুণার মুষ্টি ভিক্ষা চেয়ে
তোমার পদতল আমি রক্তে ধুয়ে
করে তুলি একান্ত আমার।

কণাদ গঙ্গোপাধ্যায়

যে মানুষ পাথরের মতো মরে যায়

□

হলুদ মরুভূমির মাটি ছুঁয়েছে সবুজ চাঁদের আলোয় ধোয়া আকাশ
নতুন পাতিলেবুর মতো সবুজ চাঁদ
কতোদিন স্বপ্নে আর অন্ধকারে জেগেছিল নির্জন পশ্চিমে
সেই একদিনের একবার দেখা অলৌকিক চাঁদ
চিন্তায় বিহ্বল এই করোটি গহ্বরে
এক নতুন দৃশ্যপটের জন্ম দিল
হলুদ মরুভূমির মাটি ছুঁয়ে রইল সবুজ চাঁদের আলোয় ধোয়া
সবুজ আকাশ।

আমার তোমার নয়—বিম্বিসার অজাতশত্রুর
পদস্পর্শে যে পাথর বেজে উঠেছিল
করুণাঘন প্রজ্ঞা আর হীন চক্রান্তের নিষ্ঠুরতায়
গান গেয়ে কেঁপে নেচে ভেঙে পড়েছিল যার মর্মরিত আত্মা
সেইখানে স্বপ্নহীনতার সেই মধ্যশেষ যামে
একা অলৌকিক চাঁদ একবার দেখা দিয়েছিল!
একবার সেই শেষবার!

এইভাবে স্বপ্নে পাওয়া সোনার কাঠিতে
কতোদিন কতো আলো
ফোয়ারার মতো নেচে ওঠে
তারপর পাথরের মতো মরে যায়।

সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়

জাগরণ

□

মানুষ কি ঘুম থেকে আদৌ জাগে নি ?
কিছুটা জেগেছে তবে পুরোপুরি নয়।
ভুল ও সমর্পণ লুকিয়ে
যৌবনের দ্রুততার কথা বলতে মানুষের অভিলাষ হয়।
মধ্যাহ্ন ও বিকেলের টানাপোড়েনে
জলের পিঠে আছড়ে পড়া রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে
ক্রুদ্ধ ঘোড়সওয়ারের মতো ছুটে যাওয়ার স্বপ্ন
মাঝে মাঝে সেও দেখে থাকে।
কিন্তু সে কোথায় যাবে কতদূর
কারো সঙ্গী হয়ে কিংবা নিতান্ত একাকী
তাকে কেউ এসব বলে নি, তাই
বৃক্ষ, সন্ধ্যা ও নারীর দিকে
বড় বেশী অভিমুখী হতে হয় তাকে।
গন্তব্যবিহীন তবু দৃপ্ত পথিক
অকস্মাৎ মাথা তুলে দাবী করে
বোঝাপড়া জোড়াদীঘি স্বর্গের উঠোন।
কিছুটা জেগেছে তবু
তাকে আরো জাগতে হবে,
নিম্নমুখী স্রোতের মধ্যে মাথা তুলে বলতে হবে,
'তোমাদের সঙ্গে আমি কোথাও যাবো না'।
রাম শ্যাম যদু ও মধুকে নিয়ে
দূরে বহুদূরে, স্বপ্নের উঠোনে তাকে ছুটে যেতে হবে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা

বাকি

□

পাথরের জন্যে নয়, নদী ঝর্ণা—তারও জন্যে নয়
আমি আসি ডালপালা ভালোবাসি ব'লে
তার নিচে দাঁড়িয়ে দেখার
লোভ থেকে, আসি
ভালোবাসি
সবুজ পাতার মুখে ধুলো
ফুলগুলো।
যখনই সময় পাই, আসি
টের পাই পাতা ঝরে গেছে
গজিয়েছে কিছু
আমি মুখ নিচু
ক'রে কিছুক্ষণ থাকি
তারপর ঘরে ফিরি
কিছু কি দেখার ছিলো বাকি ?
কিছু কি দেখার ছিলো বাকি ?

ক্ষুরের ঝড়ে

□

গলির মুখে নদীর মতো চওড়া রাস্তা
কালো পিচের কঠোর ভেঙে ছুটছে গাড়ি
এখন গভীর নিশুতি রাত এই শহরে—
যাচ্ছি বাড়ি।

দুজন মানুষ দুজন ছায়া—ওপার যাবো
হঠাৎ ক্ষুরের হল্কা আওয়াজ থামিয়ে দিল

একটি একা ঘোড়ার দাপট মৃত্যুমুখী
রাস্তা জুড়ে পিচ, বেদনার গঙ্গানদী !

পথের উপর লুটিয়ে প'ড়ে কোন্ খেয়ালে
মারমুখী তার দাপট শুধু দাঁড়িয়ে-ওঠার
ছোটার কথা অনেক পরে, রাত পোহালে
চোখের উপর দুলছে নদী, দালানকোঠা।

ভয় পেয়েছি ভীষণরকম, আমার মতো
কিম্পুরুষের সাধ্য কি তায় জড়িয়ে ধরে ?
মুখটি তুলে বলে, আমায় চিনতে পারো ?
ক্ষুরের ঝড়ে হল্‌কা তুলে পুড়ছে নদী ॥

ছল

□

যেন একটি প্রশ্ন নিয়ে ভুল পথে যাচ্ছিলে
অথচ দিন শীতল, তুমি পাগল হতে চাওনি
মাছের সার পাতের পাশে কাঁটাটি খাচ্ছিলে
আজ যেমন হঠাৎ পেলে তেমন করে পাওনি

কীসের এক প্রশ্ন নিয়ে ভুল পথে যাচ্ছিলে
হঠাৎ দেখা, চেনাও গেলো, ছিলো না তাচ্ছিল্য ॥

গৌরাঙ্গ ভৌমিকের কবিতা

ঐ যে পাহাড়

□

বেশ ছিল সে এতকাল চোখের পাতা ভারি করে,
বেশ ছিল
ক্যানভাসে লীন ছবির মতো।

আমার ডানা ছিল উড়ে যাবার।

ট্রেনে উঠতেই ঝমরঝম, অবিরল শিলা পতনের শব্দ,
দৃষ্টি চৌচির সংঘাতে।

গন্তব্যে পৌঁছুলুম
একা, আমি দৃষ্টিহীন, ডানাকাটা।

অন্ধ প্ল্যাটফর্মে
শুধু মানুষ, মানুষেরই ভিড় জমে।

হালকা মেঘের দেখা নেই,

এই হিল-স্টেশনে
আদিম শিলারাশি, অতিকায় শিলার স্তূপ, সামনে
পাহাড়,
অন্ধকার।

এখানে আসব, আমি কোনোদিন ভাবিনি।

সাময়িক

□

একদা জ্যোৎস্নার রাতে বহুলোক ধর্মযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিল,
পুরোনো গির্জার গায়ে তার কিছু স্মৃতিচিহ্ন আজও লেগে আছে
সুদূর, প্রাচীন আর ভীষণ স্যাঁতসেতে।

তখনো সময় ছিল, সাময়িক, আজও রয়ে গেছে
চঞ্চল শিশুর মতো, পলাতক, দৃশ্যলীন। তাকে
বৈদিক নক্ষত্রবিদ কোনো শর্তে পারেনি ফেরাতে
গ্রীষ্ম থেকে হেমন্তে কি বসন্তের রাতে বা প্রভাতে।

তখনো সময় ছিল, সাময়িক, আজও রয়ে গেছে।

ঠাকুরদাদার বাবা অম্বুরী তামাক খেত উষ্ণীষ মাথায়,
প্রেম করত, হাসিঠাট্টা, সুপ্রাচীন রাত্রির ভাষায়।
পায়ের গম্ভীর শব্দে সিঁড়ি ভাঙত, সেই সব সিঁড়িগুলি
রোজই ভাঙে, রোজই ভেঙে যায়।

তখনো সময় ছিল, সাময়িক, আজও রয়ে গেছে
পুরোনো গির্জার গায়ে, কাম্পানায়, সুদূর, স্যাঁতসেতে।

ব্য তি ক্র ম

কেবল পাখিরা কোনো সময়ের হিসেব রাখে না,
হলুদ-সবুজ-নীল-শাদা পাখি দিনপঞ্জী পারে না বানাতে—
তাদের অরণ্যবাসে ক্যালেণ্ডার নেই।

এইসব প্রতীক সঙ্কেত

□

কোথাও মাদল বাজে, ডিমডিম, ধ্বনির ভেতরে বাড়ে ধ্বনি।
প্রহরে প্রহরে বাড়ে, ময়দান-চত্বরে, বামনের কণ্ঠস্বর শুনি।

রাত বাড়ে, ঘন হয়, বধিরতা বেড়ে যেতে থাকে—
না-শোনা শব্দের ফাঁকে
কারা যেন অতর্কিতে ভুল নামে ডাকে।

কার নামে কারা ডাকে? কার নাম? কার?
স্পষ্টত শোনার নয়, এইখানে
কুয়াশা গহীন, অন্ধকার।

গতকাল কার যেন চিঠি এসেছিল,
পল্টন ময়দানে সন্ধ্যা নেমেছিল সূর্যাস্তের পর।

আমি এর গূঢ় অর্থ কিছুই বুঝিনি।

আমি শুধু শুনেছি ঘর্ঘর,
আমি শুধু শুনেছি ঘর্ঘর।

আশিস সান্যালের কবিতা

বসেছিলাম

□

বসেছিলাম অন্ধকারে।
চারদিকে
হিংস্র অজগরের মতো
বুকে ভর দিয়ে
কেবলই নিশ্বাস ফেলছিলো
কালশিরে হাওয়া।
যেন অনেক কালের
পাওয়া না-পাওয়ার বেদনায়
ছড়িয়ে পড়ছিলো
হিম রাতের একক নির্জনতা।

কেমন করে বেঁচে থাকবো
আরেকটা দিন,
এমনি এক ভাবনায়
ঝট্‌পট্‌ করতে করতে
দুঃখ থেকে
অন্য এক গভীরতর দুঃখের দিকে
কেবলই প্রসারিত হচ্ছিলো
আমার হৃদয়।

ক্রমে ইতিহাস
ছায়া ফেলতে লাগলো
আমার চেতনায়।
আমার সামনে।
ছড়িয়ে পড়তে লাগলো
শত শত শতাব্দীর
চাপ চাপ রক্তের দাগ।

যে নারীর বুকে বুক রেখে
একদিন
সর্বস্ব দু'হাত ভরে দিয়েছিলাম,

তার নিরাবরণ প্রতিকৃতি
উজ্জ্বলতর হতে লাগলো
ক্রমে আমার সামনে।
আমি দেখলাম,
শাদা মোমের মতো গাল বেয়ে
আজো তার দু'চোখ থেকে
ঝরে পড়ছে
তপ্ত সোনার মতো জল।

সেই চোখের জলে
ভিজিয়ে নিলাম
এ-জন্মের
আমার রক্তাক্ত ভালোবাসাকে॥

ফিরে এলাম

□

সমস্ত দরোজা
তুমি বন্ধ করে,
ভেবেছিলে
একদিন আলোর অভাবে
হয়তো বিবর্ণ হবো।
হয়তো বা কোনো এক
কুটিল ঝঞ্ঝায়,

শুকনো পাতার মতো
ভেসে যাবো
অস্তহীন অন্ধকারে
বিস্তারিত রাতের গভীরে।

অথচ আশ্চর্য দেখ—
দেখ চেয়ে
তোমারই সম্মুখে
খুলে গেলো পশ্চিমের
অনন্ত দরোজা।
চকিতে দূরের থেকে
উড়ে এসে
নক্ষত্রের শফেদ পালক
ছড়িয়ে পড়লো দেখ
আমার শরীরে।

বুকের গভীর ক্ষত
ধুয়ে গেলো
রাতের স্তনের থেকে
ঝরে পড়া
মসৃণ শিশিরে।
প্রশস্ত দরোজা দিয়ে
ফিরে এলাম
চেয়ে দেখ
মুখোমুখি তোমারই সম্মুখে।

পুরাতনী

□

নিমতিঝোরা গ্রামের নাম,
নদীর নাম ডিমা,
চলতে চলতে অনেকটা দূর
ছাড়িয়ে তার সীমা

এলেম হেঁটে সোমেশ্বরী
নদীর পাশে যেই,
দেখি হাজার পাখির মেলা,
আমার যে'টি নেই।

হলুদ বনের সবুজ টিয়া,
ছোট্ট আমার পাখি,
তাকেই আমি সারাটি দিন
বুকের কাছে ডাকি।

কেউ বোঝেনা আমার কথা,
দুঃখ দারুণ বিধি,
হাজার পাখির রঙীন মেলায়
আমার প্রতিনিধি—

দেখিনা হায়—কেবল দেখি
সামনে সবুজিমা,
নিমতিঝোরা গ্রামের নাম
নদীর নাম ডিমা।

গৌতম গুহর কবিতা

এসো পূর্ণতা

□

অদ্ভুত পূর্ণতা নিয়ে একবার একদিন সরীসৃপ ট্রামে চলে গেছি
দু'ধারে কাতর মাটি, পরস্পর শরীরে হেলান
যুবকযুবতী পাশে হাঙর হিংস্র দাবি দাহ
দিব্বি ভুলেছে
অথচ উদরে ক্রোধ, চণ্ড রং চোখে, একদিন আগেও জ্বলেছে
একভরি পূর্ণতা পেয়ে তবে কি বদলে গেছে সব—

আহা রে পূর্ণতা পরম, তুই এত মূল্যবান কেন ?
মূল্যবান এত যদি জহুরীর কাঁচবাক্সে বন্দীজীবী কেন

আমার দৃষ্টিতে আয়, স্পর্শে আয়, ঘ্রাণে আয়
মুহ্যমান তৃষ্ণার প্রাণে
লক্ষ লক্ষ তারাজ্বলা রাত্রির আকাশে আয়—
প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, প্রতিপল, আকণ্ঠ ভোজের পর
পেটুকের ঢেকুরের মতো—আহা !

সংলাপ

□

আয়না সামনে রেখে নিজেকে বিচার করি
বলি : আমাকে তুমি চেন ?
হোঃ হোঃ হাসে প্রতিচ্ছবি
প্রশ্ন করি, আমাকে দেখেছ ?

খুশি হ'বো হ'বো করে
খুনী হয়ে ওঠে ছবি
—তোমাকে ?
—তোমাকে ?

রাত্রির দ্বিতীয়যামে নগ্ন বকাসুর
তোমাকে সবাই জানে ভয়ংকর পশু
আলালী আদরে মাতামহ কী নামে যেন ডাকে

পৃথিবী দিয়েছে ঢের আলো, তাপ প্রসাধন
তারপর, হয়েছ গ্রেপ্তার ঝুমকো লতার ;
তক্ষক তক্ষক তুমি জানো
তুমি ডাকো হৃদয়পাতালে।

প্রতিবিম্ব ভেঙে যায়
আর্তনাদে চূর্ণ ছবি বলে :
সুখী হবে বলে শরতের হাসি হেসেছিলে
কোনো এক হরিদ্রাভ ভোরে
তারপর জুড়ে দিলে হাসি
থামের মুখের মতো জল দিয়ে
—এরকম ঘাতকতা চলে ? এত দ্রুত ? এত অনায়াস ?
তক্ষক তক্ষক তুমি ডাকো
তুমি ডাকো হৃদয়পাতালে।

অনুসরণিকা

□

আমি নামছি সিঁড়ি বেয়ে
ঘন অন্ধকারে
মনে হয় তুমি নামছ আমার পিছনে
লঘু পায়ে
নিশাক্লান্ত সুরের মতোন
কী এমন কথা থাকে যা কখনো স্পষ্ট হয় না ?
তারকা মেঘের অন্তর্বর্তী থেমে যায় যদি এই সিঁড়ি
অস্থির মন হতে খসে পড়ে শুষ্ক নিষিদ্ধতা

আমি নামছি সিঁড়ি বেয়ে
পায়ের শব্দে ভাঙে পড়শীর ঘুম
বাতুল বিভাব চিন্তা নড়াচড়া করে।

একবার মনে হয় তুমি নামছ
কোনো পূর্ণতার রেলগাড়ি থেকে—

এইভাবে আমি ইচ্ছা করি
তোমার ইচ্ছের কুঁড়ি চোখ মেলে চায়
ধীরে ধীরে অতিধীরে
তবু এক সংশয়-সংকটে এসে কথাগুলি বোবা হ'য়ে যায়
কী এমন কথা থাকে যা কিছুতে স্পষ্ট হয় না ?

সিঁড়ি নামে নিচে
একবার তেতে ওঠে মন
সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে চায়
অনেক উপরে
স্পর্শ ও দৃষ্টির ঊর্দ্ধে, নিরুদ্ধ আলোকে
কথা না বলার দুঃখ যদি ভাঙে
শান্ত হয় মন
তোমার আমার
আর আমাদের মতো যারা ভাষাহীন দুঃখ নিয়ে জাগে

পৃথিবীর দূরে, পৃথিবীরই একান্ত প্রিয় কথা
মানুষের দূরে গিয়ে মানুষীর জন্য মূল বোধ
আমি উঠছি অনেক উপরে
মনে হয়
তুমিও উঠছ।

অতি মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

গর্জন-সত্তর

□

ক্রমাগত একইভাবে শব্দকে ব্যবহার করা
হেসে ওঠে বারবনিতারা
চিবুকে আঙুল রাখে কবি
জানেনা সে কখন ভেঙেছে লকগেট
এবং কোথায়
খ্যাপাটে বাতাস এসে
এক বুক জলকে নাচায়।

এনামেল ক্রমে ঝরে অথবা তা' যাবে
চোয়াড়ে অর্থ যেন উঁকি মারে
আনাচে কানাচে
বেলি মালা হাতে নিয়ে পর্নো যুবতী
দ্রুত ঢুকে পড়ে সেই কবির ভিতরে।

তীব্র শীৎকার……
এবং হুঙ্কার কোন ক্ষুধিত সিংহের
……অবশ্যই টেপরেকর্ডারে।

ফ্রেমের ভিতরে

□

বড়ো স্থির হয়ে আছি, প্রায় বিন্দুবৎ
অচল অটল
নামে দুই থল যেন পিছু নেয়, যেন
দুই শব্দের পাহারা
চেনা যায়

এই মধ্য যৌবনে কেউ ভীষণ ভাবায়
সেকী সেই প্রথম পাণ্ডব
স্বর্গারোহণে ?

স্থিরতা কি জানে
সোনালীর কারুকাজে ফ্রেম
ফ্রেমের ভিতরে-ছবি.....রঙ
এক ভিতর-মানুষ
ঝুলছে দেয়ালে।

ফিরে আসে
□
এক মাঘে যায় নাকি
হাত ঘুরে ফিরে আসে তাস
রুহিতন চিড়িতন টেক্কা কি বিবি
অথবা বাতাস
কিংবা নেকড়ে কোন সেই
দরোজায় দরোজায় ঘোরে।

ঘরের ভিতরে কাঠ পোড়ে
কচি কাঁচা ডালপালা
ছিন্ন পাহাড়ী
ফুঁসে ওঠে অক্ষম
প্রতিবাদী ধোঁয়া
আর, তাপ সারারাত।

মাঝপথে ফিরে আসে শীত
ফিরে আসে কাঠুরের
শীর্ণ হাতের নীল
শিরাপথ ধরে।

জয়া রায়

আনন্দ স্বদেশ

□
অমল আলোর সুধা ঝরে
বুকের গভীরে যেন ঘন বৃষ্টিপাত
দিন ঝরে বক্ররেখা প্রকৃতির
নিটোল কপোলে
সন্ধ্যার কালো চুল
সমুদ্রের নিরুত্তাপ ধবল শয্যায়
উড়ে যায় মুক্ত সারসেরা

তখন জলের দ্রবণ হতে উঠে আসে
অমৃত লাবণি, আনন্দ স্বদেশ
হলুদ শস্যের ভারে গর্ভবতী দ্বীপ যেন
জননীর পুণ্য স্তনভূমি
ভূমির নাভিতে সুধা
নীলকণ্ঠ মন্থন শেষে উঠে আসা
অমৃতের সবুজ আকাশ,

আমি পান করি
ভালবাসা, আনন্দ স্বদেশ, শস্যের সাধন
বুকের গভীরে দ্রুত মুগ্ধ বৃষ্টিপাত,
তারপর অমল আলোর সুধা ঝরে,
ক্রমশই ঝরে...
গড়ে ওঠে প্রকৃতির নীল ওষ্ঠে ভালবাসা,
বাসযোগ্য ভূমি।

দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বয়েস

□

কেবল থাকার মধ্যে এক বটগাছ
বিষুবের গ্রীষ্ম পার হয়ে
দুদণ্ড বিশ্রাম নেয় এখানে যাত্রীরা
অথচ এও তো শেষ নয়
কে আটকাবে কাকে ?
এই দীর্ঘপথে বড়োই জেহাদ
দিগন্তে হারিয়ে যায় আমাদের সমস্ত বয়েস।

রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়

স্পর্শ

□

তোমার স্পর্শ পেলে সব ছেড়ে চলে আসি
ঘরদোর আশ্রিত আশ্রয়।
তোমার স্পর্শ পেলে টেবিলে-টেবিলে খাতা
তাক ভরতি বই
সব ছেড়ে চলে যাবো
বাইরে নয় ঘরে।
যেখানে যেমন আছে সাজানো আসবাব।

যে রকম খাঁচার টিয়া উড়ে যায়
বাইরে নয় ঘরে।
তোমার স্পর্শ পেলে আমিও খাঁচার টিয়া
উড়ে উড়ে
মাঠ, নদী, আকাশ পেরুবো।

শুভ মিত্র

আরসী নগর

□

সারাদিন ধুলোখেলা,
দেহে-মনে খুনসুটি সারাদিন...
সারাদিন ভেঙ্গে যাওয়া অকারণ...

এইভাবে মরে যায় রোদ
বিবর্ণ হলুদ পাতা লাল হয়
চুপচাপ কেঁদে যায় হাওয়া
চুপচাপ

তারপর, চারকোণের চারটে খুঁটে
রাত টাঙিয়ে দেয় মশারি

আমি স্বপ্নে দেখি, অন্ধকার
আরসীনগর...

স্বপন রায়

কবির স্নান

□

আপনারা বসে থাকুন যে যার অবস্থানে,
নতুন সঞ্জীবনী হাওয়ায় বেড়ে ওঠা এক ঝাঁক
উজ্জ্বল শরীর আসছেন গ্রামগঞ্জ পেরিয়ে
আমাদের এই শহরে।

আমরা আমাদের আর এক শরীরের ধুনো জ্বালিয়ে
প্রতিধ্বনির মত আর এক শরীরের ধুনো জ্বালিয়ে
হাঁটু গেড়ে বসে আছি এই প্রধান সড়কে
তাদের অভ্যর্থনা জানাব বলে।

ওদিকে,
ভিতরে 'ডে' 'নাইট' শিফ্‌টে সমস্ত বিভাগ উজাড়
মাথার ভিতর ঘ্রাণের অসুখ
অস্থির পায়ে পায়চারি করছেন কবি
অস্থির পায়ে...
গভীর টেলিপ্রিন্টারে সারাক্ষণ খটাখট্ ;
ভেসে আসে গভীরতম সংবাদ
'রক্তাক্ত স্নানে তোমায় পাওয়া হল না'
অন্তর্গত রক্তের ভিতর রবিশঙ্কর সেতারে ধরেছেন ইমন্।
তবু বিস্ফোরণের মুখ থেকে বেরিয়ে আসবেন—'দু তিন জন'
আমরা লাফিয়ে উঠে বলব, 'ইউরেকা' !

শান্ত রায়

সম্রাট

□

সিংহাসনের মতো বেশ উঁচু, আরামদায়ক
বটের গুঁড়িতে তিনি উপবিষ্ট
বৃক্ষ-কাণ্ডে শরীরের ভার, চোখ বোজা।

তিন রেজিমেণ্ট মেঘ সীমান্তের দিকে ত্রস্ত চ'লে গেলো—
প্রচণ্ড নিদাঘ, সব গাছপালা জ্ব'লে যাবে যদি তারা
লক্ষ্য না করে,
একদল শরীররক্ষী নিঃশব্দে কুচকাওয়াজ করতে-করতে
এ-দিকেই আসছে ভাল রাজপথ ধরে ;
এখন তাঁর অবকাশ যাপনের সময়
মাথার ওপরে কেউ রয়েছে জানলে
তিনি খুব বিরক্ত হবেন।
অবসরে একা-একা আসেন এখানে
এ-সময়ে সঙ্গী শুধু তন্দ্রা, হাওয়া—স্বপ্নময় হাওয়া.....

তিনি ক্লান্ত, কাটা ফসলের স্তূপ অল্প-দূরে,
একটি কিশোরী আসছে কাঁসার থালায় নিয়ে
পরিপাটি বাড়া ভাত, কাঁচা পেঁয়াজ ও ব্যঞ্জন
এবং জলের ঘটি, তাঁর জন্য।

সুকল্প চট্টোপাধ্যায়

ভ্রাম্যমাণ

□

কারণ সে রকম বেদী নেই
বুকের ভিতর শৈশবের কাহিনীগুলো এসে ফিরে যায়—
জন্ম-থেকে শক্তিমান চুম্বক নেই সঙ্গে
চোখের মণিতে
গাছপালা আকাশ শব্দ করে এসে আটকে যায় না
ভ্রাম্যমাণ বেদী ফিরে যায়।
যেদিকে মুখ-ফেরাই
কুমোরেরা সমস্ত মাটি আগে থেকে সরিয়ে নিচ্ছে
কুমোরটুলিতে খুঁজতে গিয়ে দেখি
এমন কি মূর্তি গড়ার মাটি পর্যন্ত চুরি
হয়ে গেছে।

অশোক কুমার গুহ

না-বুঝে

□

সোনালী ভোরে আমি দেখেছি
আমার কাছের আমাকে সবাইকে,
ভালোবাসার ভিজে রস চুঁইয়ে পড়েছে আমার
ঠোঁটে বুকে শরীরে।
আজ ঘোলাটে সন্ধ্যার দমকা ঝড়ে সবাই
রক্তাক্ত, মাতাল আছড়ে পড়ছে
কাঁটাবনের অন্ধকারে।

কাজল চক্রবর্তী

তুমিই গন্তব্য চিরদিন

□

তুমিই গন্তব্য আমার
নিমেষেই বিপ্লব আনো, অস্তিত্বের নিঝুম পাড়ায়।
গোপন টেলিগ্রাম লেখায়, তোমার-ই রক্তচক্ষু,
গন্তব্য তুমিই, কী শীত—কী গ্রীষ্ম।

বৃথাই চেষ্টা করেছি দূরে থাকবার
গাছের কোটরে কিংবা
শুকনো বাদামের খোলে।
কখন নিজেরই অজ্ঞাতে
কাক জাগবার আগেই
পৌঁছে গেছি, তোমার ডেরায়।

আমাকে দেয়ালে ঠুকে ঠুকে
বিন্দু বিন্দু রক্তে দেয়ালে তৈরি করেছো নক্সা
চৈত্য থেকে টেনে এনে বাঁচিয়েছো।
তুমিই গন্তব্য চিরদিন।

রাজা মজুমদার

পঞ্চাশের প্রৌঢ় পিতারা

□

ওরা সব বস্তুত জঞ্জাল
বাউণ্ডুলের মতো
দিবানিশি রাস্তাঘাট চায়ের দোকানে
হৈ হৈ হট্টগোল—
মিটিং মিছিলে বজ্রমুষ্টি দুরন্ত স্লোগান!
ওরা সব আসলে বদমাস
বুনো মোষের মতো বেপরোয়া।
দিবানিশি ঘোলা করে নিস্তরঙ্গ জীবনযাপন!
ওরা সব...ওই ওরা...ওইসব ছেলেরা মেয়েরা—

পাথরের ঢিপির মতো
পঞ্চাশের প্রৌঢ় পিতারা
চেয়ারে হেলান দিয়ে
এইসব অভিযোগ ছুঁড়ে দিচ্ছে দিনরাত পৃথিবীর বুকে
অথচ
একবার মনেও পড়ে না নিজেদের যৌবনগাথা
হায়! মনেও পড়ে না
আঠারো বছরের সেইসব মারাত্মক চলচ্চিত্র—
আকাশ ফাটানো প্রচণ্ড চিৎকার!

সুনীলকুমার নন্দী

জন্ম : ১৯৩০

বৃত্তি : রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় প্রশাসনিক কর্ম
ও ত্রিমাসিক 'অমুক্ত'-সম্পাদনা

কবিতার বই

ভিন্ন বৃক্ষ ভিন্ন ফুল
প্রকীর্ণ সবুজে নীলে
সুনীলকুমার নন্দীর কবিতা
সেই মুখ
পিচ্ছিল গুহার জল

সুনীলকুমার নন্দীর নির্বাচিত কবিতা

অপরিচিতা

□

'জায়গা আছে' বললো যেন রক্তে অমোঘ ছড় টেনে কে—

গভীর রাতের অন্ধকারে ট্রেন ছুটেছে, নম্র আলোয়
মুখের রেখা আবছা···কে···ওই ট্রেনের চাকার ঝম্ ঝম্ ঝম্
শব্দে যেন সুর দিল সে—
বুকের তলে বাজতে থাকে, 'জায়গা আছে, জায়গা আছে'।

অন্ধকারের হয়তো মায়া ; ভোরের আলোয় ট্রেন থেমে যায়—
ব্যস্ত সবাই···নামতে থাকে···মিলিয়ে গেলো···মিলিয়ে গেলো
মিলিয়ে গেলো মুখের রেখা···
অন্ধকারের সেই সে-মায়া আলোয় তবু মুখ লুকিয়ে
বুকের তলে বাজতে থাকে, 'জায়গা আছে, জায়গা আছে'।

পথের মতো ছড়িয়ে যাওয়া, ছড়িয়ে যাওয়া আমার ভুবন
শব্দে-ফেরা তৃষ্ণা ছুঁয়ে ভর দিতে চায় সুদূর শিখর।

ধস

□

মৃন্ময়ী, একবার বলো
সব মিথ্যে···অরণ্যকুহক
আমি
কত অনায়াসে দেখো নক্ষত্রের দাহ
পায়ে পিষে
তোমার উড়ন্ত চুল, চোখের বনজ মেঘ
ভালোবেসে হতে পারি
অবিশ্বাসী পৃথিবীর সর্বশেষ আনত প্রেমিক ; হিম
রক্তের ভিতরে টানি

টানটান বুকের ছিলায় রেখে পঞ্চশর
যদি
মৃন্ময়ী, একবার বলো
সব মিথ্যে···অরণ্যকুহক এই
লোকালয় প্রচণ্ড নিষ্ঠুর, ঈর্ষা
তলে-তলে কুরে খায়
ধস।

বেজে ফেরে বিসর্জন অথবা বোধন

□

অসংখ্য শব্দের মধ্যে এমন দু'একটা শব্দ
কী-যে-কী ঘটায়—
ঢেউ ভাঙে
ঢেউ তোলে
ঢেউ-এর চূড়ায়
বেজে ফেরে বিসর্জন অথবা বোধন···
এর
মাঝামাঝি
আপাতত বেচাকেনা
জোড়াতালি
ইত্যাদি ইত্যাদি কিছু নাগালে থাকে না

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সিংহাসনপ্রতিম ভঙ্গিতে
এমন দু'একটা শব্দ
বুনো ছাতিমের মতো
বুকের গভীরে নেমে
বুকের গভীরে যেন কী-যে-কী ঘটায়—
বেজে ফেরে বিসর্জন অথবা বোধন···

আমি পুরোহিত, আমি···

□

আমি পুরোহিত, আমি···
পদতলে পড়ে আছি,
আমি পুরোহিত,
আমি
বক্ষে জ্বালি ধূপ···ধোঁয়া···শব্দে-শব্দে
শব্দে-ফেরা আরতির ধূপে
তুমি যে রহস্যময়ী

পরিচিত
খোলা বাহুমূল স্তন নাভিতলে ঢালু বনভূমি
শব্দে-শব্দে ঘন নীল-ধূমল আবডালে
অলৌকিক···
চলচিত্র
সুদূর গরিমা ঢালে, নতজানু আকণ্ঠ উৎসাহে
তুমি যে আশ্রয়
যেন
স্বপ্নের বিস্তারে-ময় কেমন প্রতিমা

আমি না-জ্বালালে, ধূপ
শব্দে-শব্দে আমি-না-জ্বালালে
তুমি সাধারণ
মেলার পুতুল,
তবু
আমি পদতলে—
দীন পুরোহিত ভিন্ন মুগ্ধ চোখে পরিচয় নেই।

হাতের মুদ্রায়

□

হাতের মুদ্রার থেকে বাহুমূল—
বাহুমূলে
উলঙ্গ রক্তের শিখা যতই নাচুক
বাহুমূল নেমে যায়
নেমে গেছে
গভীর গোপন বেয়ে নিগূঢ় জলায় জলে
গাঢ় টান
শিকড়-বাকড় ছুঁয়ে শরীরে চারায়···
চোখে, মুখের রেখায়
তাই এত চিকন পত্রালী ছায়া, হাতের মুদ্রায় ফোটে বকুলের স্বর

রক্তে-ফেরা ক্ষুরধ্বনি
চড়াইয়ে
উৎরাইয়ে
খাদে
প্রতিহত, ফিরে আসে
হাতড়ে-হাতড়ে বাহুমূল
হাতের মুদ্রায়···
রক্তে
ছায়া পড়ে
যেন শস্যডোবা মাঠ বিমূঢ় বিষাদে !

জল, এই জল

□

আমার ছেলেকে যেন ফুসলে-ফুসলে নিয়ে যেতে চায়
নিয়ে যেতে চায় জলে, জলজ হাওয়ায়···

বেশ তো

ভরাজলে একদিন আমিও ভিজেছি, জল
ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ছোট-ছোট সীমানা খসায়—
প্রাচীন বাতাস বৃক্ষ বিলিকেটে,

বিলিকেটে মণ্ডপের গালগল্প
চাতাল কার্নিস ঘর
শেওলাধরা ঘরের অভ্যাস,
রূপালি মাছের ঝাঁকে পদ্মবনে
সোনালি কলসডোবা দিগন্তরেখায়
চোখ
ছাপাতো বিস্ময়ে, ঘন
চারিদিক বুকভাসা উৎসব-উৎসব !

অথচ আমার ছেলে ঘরে ব'সে জল দেখে, গলির কোনায়
গড়ায় এত যে জল তাৎপর্যবিহীন, নিঃস্ব
জানুথসা
জলে পা রাখে না, হয়তো জেনে গেছে
ডাইনীর ফুসলানো জল, এই জলে
মানুষের কিছুই মেলে না ; তবে
জলের বিস্তারে সেই স্বাভাবিক বিপুল ভুবন ?
হয়তো
তাকে পেতে ভাঙতে হবে সাজানো পাথরে-পীচে জমাট কংক্রিট
চেতনার আঘাতে, আঘাতে বইবে
ছড়ানো বহতা গঙ্গা, মাটি-ছোঁয়া টলটলে জলে
আবার রূপালি মাছ···পদ্মবন···সোনালি কলস···কিংবা
ভিন্ন হোক, ওরই কাছাকাছি কোনো
মানুষের ভিতর জাগানো যেন কেমন উৎসব !

গোলাপের খেলা চলে

□

বড় উচ্চারিত, রক্তে
কে তুমি, গোলাপ
যেন
গোলাপের খেলা চলে সারারাত
ধবল মেঘের মতো ছড়ানো সোপানে, জ্যোৎস্না

নিভে আসে, নারী
ভুলে যায় স্রোতরেখা, ভুলে যায়
খসে গেছে
স্রোতের উজানে কবে বাদশাহী খিলান, সেই
খিলানে খিলানে-ফেরা
চোখের দর্পিত যত ধ্বনি-প্রতিধ্বনি
বড় উচ্চারিত, রক্তে
কে তুমি, গোলাপ !

সাইকেল

□

ঘুড়ি ও লাটাই কিনতে
কাক-ডাকা ভোর থেকে সাইকেল চালিয়ে
একা-একা
ছেলেটি চলেছে, যাবে মেলায়, প্রথম এই
বাইরে আসা ; গাঁ
পার হ'তে হঠাৎ পথ চারদিকে ছড়িয়ে যায়
মাঠ, এখন কোনদিক
খুঁজতে-খুঁজতে রোদ বাড়ে
মাথার উপরে ঝাঁ-ঝাঁ দুপুর গড়ায়, সন্ধ্যা
ছায়া ফেলে, অন্ধকার
সাইকেলে জড়ায়, দূর
দূরের আলোর মালা
অন্ধকারে ফুটিফুটি, হয়তো মেলার ; আলো
চোখে টেনে পথের নিশানা গড়ে
সাইকেল চালায়, ছেলে
মেলায় পৌঁছতে গিয়ে
বয়স বাড়ায় যেন, সাইকেল চালায়।

কবিতার মুখ

সুনীলকুমার নন্দী

নান্দীমুখ

সব সময় নয়, আমরা জানি, কোনো-কোনো বিরল মুহূর্তে কবিতার শিখা অদৃশ্যভাবে জ্বলে ওঠে। যা কিছু ঘটে তার পিছনে কোনো-না-কোনো প্রক্রিয়া কাজ করে, কিন্তু কবিতা জ্বলে ওঠার পিছনে কী সেই প্রক্রিয়া, এ-প্রসঙ্গে আমাদের ভাবনা প্রায়শ পথ হারায়। পথ হারায়, তবে ক্লান্ত হয় না; বরং পথ-খোঁজার উত্তেজনায় বারবার পথিক হয়। আমার ভাবনা আজো সেই পথিক।

জন্ম

আশেপাশের দৃশ্য-দৃশ্যাবলী ও নানা কর্মকাণ্ডের ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের ইন্দ্রিয়ে যে-কম্পন ছড়িয়ে যায়, তারই ঢেউয়ে-ঢেউয়ে মনের তলদেশে অনুভূতি স্বাভাবিকভাবে জমে। এ-অনুভূতির সংকলিত চাপ, যিনি শব্দ-নির্বাচন ও বিন্যাসের অধিকারী তাঁর হাতে, কবিতার রূপ পায়। কবিতার এই মগ্ন সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটে ধ্বনি, বাকপ্রতিমা, প্রতীক, পুরাণ ইত্যাদির অবলম্বনে —না, শুধু অবলম্বনে নয়, তাদের ব্যবহার-কৌশলে। তাদের শরীরে অনুভবের চাপ কখনো মিশিয়ে, কখনো-বা একটু অন্তরালে ঠেলে দিয়ে কবিতার মাত্রা, কবিতার গভীরতর সংকেত আমরা বাড়িয়ে তুলতে পারি। এই প্রক্রিয়ায়, আমার কাছে, কবিতার ড্রামাটিক টেনশন নিয়ন্ত্রিত হতে-হতে অধিক তীব্র অথচ অকৃত্রিম হয়ে আসে। আবেগ গাঢ় হয়। তাই আমাদের ভাবগত উচ্চারণে বাচনিক শ্বাসক্ষেপ মেলাতে গিয়ে কবিতার দীর্ঘ পংক্তি আরো ঝুলিয়ে বা সেই পংক্তি ভেঙেচুরে, ধ্বনির স্পন্দন এমন স্বভাবজ ভঙ্গিমায় তুলতে চাই, যাতে অতিরিক্ত আওয়াজের বাচালতা না-লাগে।

জৈবিকসূত্রে অধিগত অনুভূতির স্বরূপ বড় গতি-অসহিষ্ণু। ফলে অনুভূতি যেখানে কেবলমাত্র সম্বল, সেখানে আমাদের আবিষ্কার-পুনরাবিষ্কারের সোপানে যে-বিশাল বস্তুবিশ্ব, তার ঐতিহ্যের সঙ্গে সংলগ্ন অন্তর্নিহিত স্বপ্ন ও সংকল্পের ছায়াপাত সম্ভব কি? অথচ আমাদের চূর্ণ অনুভবমালার রহস্যনীলে কবিতার আবেগ, কবিতার পদধ্বনি; আর তার বিস্তার-বৈচিত্র্যে তাড়িত

কবিতার চৈতন্য। কবিতার এই চৈতন্যে, আলোড়িত অনুভবের যে-অন্তর্লীন গতিবেগ ও স্বরান্তর প্রোথিত থাকে, তাকে মেলানো কঠিন কবিকর্ম-প্রত্যাশী।

দ্যুতি

কবিতার স্বরান্তরিত প্রবাহে, সহজাত ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গে এসে যায় বস্তুবিশ্বের নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাসআশ্রয়ী অভিজ্ঞান বা ঐতিহ্য ও সৃজন-নীলিমার মিলিত সংরাগ: কবির ত্রিকালবিস্তারী ভাবনাপ্রতিভা—যা কিনা, দেহজ কামনা-বাসনার ভিতর দিয়ে বিচ্ছিন্ন সময় বা সময়ানুভূতির বলয় ব্যাপ্ত করে। এবং অনুভূতির সঙ্গে চেতনার গোপন মিলনের পথ করতে গিয়ে নতুন দিগন্তের সাড়া পায়। বস্তুত, অনুভূতি থেকে চেতনা ক্রমশ খুলে যাওয়ার মধ্যবর্তী ঢালু খাদে গুনগুনিয়ে ফেরে কবিতার নিগূঢ় উপলব্ধি, কবিতার ভ্রমর।

কিন্তু ইতিহাসআশ্রয়ী অভিজ্ঞান ও সৃজন-নীলিমার দর্পণে চেতনার যে উজ্জ্বল প্রতিভাস, তাকে আবার ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভিতর-টান সেই আদিমতম অন্ধকারে—যার শিকড়-বাকড় আমাদের রক্তে, রক্তের অন্তর্গত গুহাময় জলায়—না-মেশালে, পরিণামে সে রক্ত-মাংসের অবয়ব-খসা সিদ্ধান্ত বা সত্যের হাড়গোড় খোঁজে। সত্যে উপলব্ধির দাহ নেই, সত্য উপলব্ধির অস্তিম। তাছাড়া, যে-কোনো সত্যই তো জীবনের খণ্ডাংশ।

কবিতার পরিণত উৎসাহ তুলে আনতে চায় বহুকৌণিক জীবনের কোণে-কোণে ছড়িয়ে রয়েছে যে-অসংখ্য সংবাদ, তাদের আভ্যন্তরীণ উপলব্ধি, উপলব্ধির তাপিত বিচ্ছুরণে প্রসারিত তৃতীয় আয়তন: কবিতার অন্তঃস্থ বিভা (vision)। ঘটতে থাকে আমাদের প্রচলিত ধারণার, আমাদের সীমা-বদ্ধতার বিন্দু-বিন্দু জন্মান্তর বা ক্রমমুক্তি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা

গোল্লাছুট

□

মানুষ হলো সংখ্যা, আর সংখ্যার তো মন থাকে না !
কত মানুষ এলো, এবার কত মানুষ গেল ?
তিন কিংবা তিনশো কিংবা পঁচিশ তিরিশ হাজার
শূন্য, শূন্য
ট্রেন লাইনের দু'পাশ জুড়ে পড়ে রইলো
মানুষ নয়, সংখ্যা
জলে কাদায় খাঁ খাঁ রোদে সংখ্যাগুলো
উল্টে পাল্টে শোয়
কত মানুষ এলো এবার কত মানুষ গেল ?
গাছের ডালে কে ঝুললো, গাছ কেটে কে
বানালো তার বসত,
নদীর জলে ভাসলো শব, আবার কেউ
সাঁতরে গেল ওপার
কে কে গেল, ক'জন গেল, কারা ভেড়ার পালের মতন
পেছন ফিরলো
একটি ভেড়া, তিনটি ভেড়া, তিনশো ভেড়া,
ওদের কোনো নাম থাকে না
একটি মানুষ, তিনটি মানুষ, তিনশো মানুষ
ওদের কোনো নাম থাকে না
তিরিশ কিংবা চল্লিশ বা পঞ্চাশ হাজার, নাম থাকে না
শূন্যে নিয়ে গোল্লাছুট খেলার মতন
ক'জন রইলো, ক'জন ফিরলো
মানুষ হলো সংখ্যা আর সংখ্যার তো মন থাকে না !

শিল্প

□

শিল্প তো সার্বজনীন, তা কারুর একলার নয়
নীরা, তবে তুমিও কি সকলের জন্য ?
তুমি শুধু আমার হবে না ?
চাপা দুঃখে বুকে হিম ব্যথা হয়
এ কারুকে জানানো যাবে না
এ গোপন বিশাল সুদূর, তুচ্ছ
দেখা না-দেখার চেয়ে আরও অন্য কিছু
যেন তোমাকে আমার কিংবা আমাকে তোমার
গুপ্ত নির্বাসন
তোমার চোখের জলে
শিল্পের কিরণ
খেলা করে
যে শিল্প মধুর কিন্তু মায়ালেশহীন
শিল্প-সহবাসে আমি তোমাকে স্বৈরিনী হতে
দিতে পারি ?
চাপা দুঃখে বুকে হিম ব্যথা হয়,
এ কারুকে জানাবার নয়।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

একদিন

□

একদিন ডেকে-ডুকে বসাবো তোমাকে
গায়ে বিছিয়ে দেব সাবেক আকবরি শাল
বলব—বাবা হে
বুড়ো হয়ে গেছ তুমি—
এখন নিশ্চিন্তে জিরোও।

নিশ্চিন্তে জিরোতে জিরোতে
একদিন গাঁজা পার্কে স্ট্যাচু হয়ে যাবে তুমি
তোমার কান চুলকে দেবে শালিকের ছুঁচলো লেজ
হ্যাণ্ডবিলে ভরে যাবে তোমার শরীর
নাক দিয়ে নামবে শেকড়-বাকড়
রাগী ছেলেরা ডাণ্ডা-ছুরি হাতে
মুণ্ডু কাটার জন্য ঘুরে বেড়াবে তোমার
রাত্তিরে
বন্দুক হাতে পুলিশ পাহারা না দিলে
তুমি পাথুরে গলায় কাঁদতেও পারবে না—
প্রাণধন ওহে প্রাণধন...

অবশ্য
পাথরকে আমরা কেউ কোনদিনই কাঁদতে দেখিনি।

চিত্ত সিংহ

ক্রীতদাস/১

□

কে হে তুমি প্রতীক্ষায় আছো, এই ভেবে—
করজোড়ে দুয়ারে দাঁড়ালে
মুহূর্তে মহাত্মা হয়ে স্মিত হাস্যে করুণা বিলোবে ?

যে দাপট তোমার-ই অজিত বলে অনেকেরই মনে হয়,
সে-অনেক মূর্খ, মূঢ়, কৃপার ভিখিরি তারা—
ক্রমান্বয় জড়ো করা ক্ষমতার ধাপগুলো কখনো চেনেনি।
অথচ তুমি তো জানো, ঠিকই জানো—
যে ধাপ ডিঙিয়ে তুমি মেহগিনি কাঠের আড়ালে
নিজেকে ঢেকেছো,
ঘূর্ণিত চেয়ার টেবিলে কোচে পরিপূর্ণ
নিজেকে ভেবেছো,
ভেবে দেখো : অদ্যাবধি কতো মূল্য ধরে দিয়ে এসব তোমার
হায়, হাহাকার বাজে, ধিক্কারে, ধিক্কারে···
তবু মোহবদ্ধ তুমি, কিছুতেই পালাতে পারো না।

ক্রীতদাস, ঢের হলো, ক্ষান্তি দাও, থামো,—
অন্যের মৃদঙ্গে আর মনোহর বোল বাজিও না,
বড়ো বেশি কানে লাগে, মনে লাগে ;
এই নতজানু—
বড়ো বেশি ঘৃণ্য মনে হয়।
অথচ জীবন এই, একবার-ই
এমন জন্মের অপচয় জন্মকে ধিক্কৃত করে, বিকৃতও—

ফিতেয় আগুন দিলে যেমন হাউই
মুহূর্তে আকাশ ফুঁড়ে ফেটে-ফুটে জ্বলে ওঠে ক্ষণ পরে ছাই,
তোমার ও-উজ্জ্বলতা তেমনই
নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী, বিড়ম্বনাময়॥

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

ঝড়-পাখি

□

শাবক-ঠোঁটের তরে কিছু কিছু দিন আনে এক
ঝড়-পাখি।
বয়সের অঙ্ক বেড়ে যায়
গতির সুতীব্র বেগে, ট্যাক্সির মিটারে।

ডানায় চিবুক গুঁজে আমরা অনেক
দিন রাত জ্বালাই পোড়াই,
শিকড় আঁকড়ে বসে থাকি।
শাবক-ঠোঁটের দিন মুখে নিয়ে উদ্বিগ্ন কুলায়
উড়ে যায় ঝড়-পাখি—
দোলা লাগে আমাদের বুকে, ঝোপে ঝাড়ে।

লাখো লাখো বেদনার বিন্দু হয়ে আসে
মৃত্যু,
গুগ্‌লি শামুকের খোঁজে চুল পাকে,
গালে ভাঁজ পড়ে,
মাথা তুলতে তুলতেই ঘাড় ভেঙে নেমে আসে ডাল।
আমাদের সমবেত প্রার্থনায় মিলিত নিঃশ্বাসে
গড়ে ওঠে ঝড়-পাখি-শাবকের সবুজ সকাল।

শুভ বসু

গোলাপ, একটু ত্বরা কর

□

গোলাপরে তুই মেলে ধর তোর আকাশ-জমানো মুদ্রা—
গাঢ় রক্তিমে রাঙিয়ে নে তোর অম্বর।
শিশিরের খুব খর দীপ্তিতে অনশ্বর
পাপড়িকে তুই মেলে ধর, যেন
ঊষারই ছন্দ দেহ পায় সেই রূপকে।
তোকে নিয়ে যাব হাটে নিয়ে যাব শুক্রবার।

সেখানে অনেক সুখী সুখী মুখ বাবুরা আসবে—
শরীরে তাদের শ্মশানদিনের করুণ গন্ধ,
কব্জিতে বাঁধা রমণের সাথী, টসটসে মুখ,
লাল লাল ঠোঁট, ভারি স্তন ভারি নিতম্বে গাঁথা
হাট্টিমাটিম রমণী ; তাদের
হাসির শব্দ শীৎকার খুব একাকার হয়ে ফেনিয়ে উঠলে

নেচে নেচে তুই দেখাস গোপন রহস্যমালা,
গহন পরাগ, গাঢ় সুগন্ধ, অবিরল পাপড়ির
স্নিগ্ধ শিশিরে ঢল দিয়ে নামা
আকাশের খুব আপন দীপ্তি, কঠিন বৃন্তে
মাটির নিবিড় প্রয়াসের প্রায় উন্মন স্মৃতি।

ঘোর লাগলে বাবুরা দেয়,
বাবুরা দেয় বিবিরা দেয়
বাবুরা দেয় বিবিরা দেয় অনেক সিক্কা, টাকা।

গোলাপ আমার গোলাপ একটু ত্বরা কর।

অমূল্যকুমার চক্রবর্তী

হাওয়া

□

রোদ্দুরে শুকায় পাখা যাবে দূরে আলোর নৈরাজ্যে
গাছে বসা পাখি, তারি মত স্বপ্ন দেখা অনন্ত আকাশ

ধন নয় মানও নয়, ছন্নছাড়া শূন্যহাতে কী উৎসবে যাওয়া ?

সুগন্ধী ধানের গাছে হাওয়া দোলে, হেমন্তের অবিশ্বাসী হাওয়া
জানে ঘরে অন্ন নেই, কিষাণ বধূর কানে তবে কেন এত গান গাওয়া !

তুলসী মুখোপাধ্যায়

তবু যদি

অগ্রজ কথা-সাহিত্যিক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে

□

তবু যদি জেগে ওঠে ভেতরের প্রকৃত পুরুষ
দশদিকে উই-এর ঢিপির মতো সংঘবদ্ধ প্রবল প্রহার
ফুটপাথে পোকার মতো পাঁচলক্ষ মানুষের ছানা
মাংসাশী ভামের কোলে গোলাপ কুঁড়ির মতো পবিত্র প্রতিমা
উড়ে যায় বেদ গান উড়ে যায় ক্রুশবিদ্ধ যিশুর পতাকা
তবু যদি ফুঁসে ওঠে ভেতরের প্রবল পুরুষ !

অথচ কী শোভার মতো দশদিকে মনোরম জীবন পঞ্জিকা
নিভাজ নিপাট অফিস পানশালা বিনোদন ভ্রমণট্রমণ
মানবসেবায় সমবেত ধ্বনি-প্রতিধ্বনি চিত্রময় বিশুদ্ধ বিবেক
রবীন্দ্রসদনে মগ্ন ধুমধাম সুন্দরের পূজা
আর করাতের দাঁতের মতো দশদিকে অবিরাম প্রমত্ত প্রহার
দেবদারু ভেঙে পড়ে রুদ্ধশ্বাস পথের দুধারে
উড়ে যায় ভালবাসা উড়ে যায় থ্যাতলানো সংকল্প স্বদেশ !

তবু যদি জেগে ওঠে ভেতরের প্রখর পুরুষ।

জরুরী ঘোষণা :

গল্প ও নাটকের উপর আলাদা আলাদা সংখ্যা বেরুবে হয়তো কোনো দূর ভবিষ্যতে। তবে ষাট দশকের নির্বাচিত কবিতা নিয়ে একটি অপ্রতিরোধ্য দলিল বেরুচ্ছে শিগ্‌গীরই।

পুজোর কবিতা জুলাই-র মধ্যে দপ্তরে পৌঁছনো চাই-ই।

ANUBHAB KABITA PATRA
Vol. II. No. 1-2 Decl No. 193/77 Price : 2·50

Editor : Tulsi Mukhopadhyay
Printed & Published by Tulsi Mukhopadhyay, 24/2 R. N. Das Road, Calcutta-700031. Printed from Adhuna, 17/1D Surjya Sen St, Calcutta-700012